এ কালের কবিতা

বিষ্ণু দে সম্পাদিত

একালের কবিতা

পাবলিকেশানস
প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ

মাঘ ১৩৬৯, জানুআরি ১৯৬৩

প্রকাশক

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড

২২ স্ট্র্যাণ্ড রোড

কলকাতা ১

মুদ্রক

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী

শ্রীসত্যজিৎ রায়

দাম

~~ছ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা (সুলভ সংস্করণ)~~

আট টাকা (শোভন সংস্করণ)

মুখবন্ধ

সংকলনে যে ব্যক্তি সম্পাদকনামের দায়িত্ব গ্রহণ করে, ভূমিকা লেখাও তারই রীতিমতো দায়। অথচ সংকলন ব্যাপারটা, দেখা গেল, বস্তুত হয়ে উঠল, কেউই করেছে বললে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। নিজে কবিতা লেখা যেমন, লিখব ইচ্ছা করলেই লেখা যায় না, অথবা যা লিখব মনে ছিল তা লেখায় হ'য়ে ওঠে ভিন্নরকম। অবশ্য সংকলনের ক্ষেত্রে অক্ষমতাটা বা কর্তৃত্বের অভাব প্রায়ই ব্যক্তির অতিরিক্ত। এমনকি লেখা বা বই যোগাড় করা গেল না, এরকম লজ্জাকর কারণেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগতভাবে কবিতা সংকলিত করা গেল না হয়তো। তা ছাড়া প্রথাসিদ্ধ নির্বিশেষ মাননির্ণয় এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে অনিশ্চিতও লাগে। সে ক্ষেত্রে একটা সমাধান থাকে ব্যাপ্তির দিকে ঝোঁক অর্থাৎ চেনাজানা সব কবিরই অনেক কবিতা সংকলন করা। কিন্তু, প্রকাশকের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকের চেয়ে বেশি এবং ব্যবহারিক বিধি-নিষেধের মধ্যেই একালের কবিতা সংকলিত। কাজেই কবি বা পাঠক কেউই সর্বত্র সুস্পষ্ট কোনো একটি মানের আলোকপাত নাও দেখতে পারেন। হয়তো ভবিষ্যতে আমরা আবার সংকলনে প্রবৃত্ত হ'লে আরো বেশি আটঘাট বেঁধে কাজ করতে পারব, এবং তখন সম্ভব হবে অনেক কবির প্রতি আরো মনোযোগ।

বস্তুত কোনো একটি রুচির বিচারণায় এ সংকলন সম্ভব হয়নি। কবির জন্মের তারিখ, রচনার তারিখ, মননের আধুনিকতা—কোনো হিসাবই এককভাবে প্রয়োগ করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের চোদ্দ পনেরো বছরের কবিতা থেকেই সচরাচর বাংলা কাব্যে আধুনিক পর্ব নির্দিষ্ট। অথচ যেহেতু প্রমথ চৌধুরী অবনীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুজ তাই তাঁদের কবিতাও যদিচ পূর্ববর্তী, তবু স্মরণীয় মনে হয়েছে। অন্যপক্ষে আমরা স্থির করেছিলুম যে তিরিশ বছর বয়স যে কবিদের, তাঁদের সঙ্গেই সংকলন শেষ হবে, কিন্তু তাও দেখা গেল যে কয়েকজন বত্রিশে না জন্মে তেত্রিশে জন্মেছেন। কারও বা কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা গেল না, কারণ হয় তাঁরা বহুকাল লেখেননি অথবা আমরাই বই বা লেখা সংগ্রহে অপারগ ছিলুম।

নামকরণ একালের কবিতা মাত্রই রইল। কারণ আধুনিক শব্দটা খুব নিশ্চিত নয়। মারিতঁ্যা একদা আর্ট ও স্কলাস্টিকতত্ত্ব নামক গ্রন্থে পিকাসো

প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, পিকাসোর ছবিতে দেখা যায় স্বয়ং চিত্রকলারই পক্ষে আত্মসচেতমতার একটা ভয়ানক প্রগতি। এলিঅট এই উদ্ধৃতি দিয়েই ইংরেজি কবিতা ও সমালোচনার উপকারিতা নামক গ্রন্থের আধুনিক মন নামক অধ্যায়টি আরম্ভ করেছেন। অবশ্য কবিতা রচনা মাত্রেই আত্মসচেতনতার এক কর্ম। এবং সে হিসাবে আধুনিক কাব্যের বংশপরম্পরা অতিদীর্ঘ। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে যতই মানুষের ব্যক্তিসত্তা সমাজাতিরিক্ত, যতই সমাজ-বিচ্ছিন্ন-বা- বিরোধীই হ'য়ে উঠছে, ততই আত্মসচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি মাত্রাবৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তার স্বরূপেই যেন মৌলিক ভেদ দেখা যায়। কবিকঙ্কণচণ্ডী ও রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনীতে কি সেই ভেদ স্পষ্ট নয়? (সেইজন্যই বোধহয় আমাদের প্রাথমিক সংকলন আরম্ভ হয়েছিল রবীন্দ্রকাব্যের আদিপর্ব থেকে, কিন্তু তাতে পুস্তকের দেড়শো পৃষ্ঠা বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাও কবিতা হিসাবে পাঠ্য শতাধিক গান বাদ দিয়েই!) এবং কবিকাহিনী থেকে কড়ি ও কোমল-এ এসে কি বোঝা যায় না আরেক উত্তরণের সচেতন স্তর? যে স্তরে কবি আর ব্যক্তিসত্তার নির্বিশেষ আকুতির নিরাবলম্ব প্রকাশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারেননি, প্রয়াসী হয়েছেন প্রকাশকে বাঁধতে বিশেষের আততিতে, রূপের বা কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতায়। মনে হয় বাংলা কবিতার দুঃসাহসী আধুনিক পর্বের পুরোধার এই অর্থে সূত্রপাত ও পরিণতি কড়ি ও কোমল থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত। এবং এই বিকাশে থেকে থেকে দেখা যায় উপযুক্ত কাব্যিক সংকটক্রান্তি এবং নূতন নিষ্ক্রমণের পদক্ষেপ, আরেক আততির বা আততির আরেক বিন্যাস। আর তা থেকেই আসে—যদি বা যখন আসে, বাচনভঙ্গীতে কথ্যরীতির প্রাণবন্ত ছন্দ, যে ছন্দ আবার প্রতি মুখ্য কবির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয় ব্যক্তিত্বে বা পারিপার্শ্বিক স্বকীয়তায়।

টি. ই. হিউমের অর্থেই আততি বা টেনসন কথাটা ব্যবহৃত হল। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী আমার দুই পরলোকগত বন্ধুর মধ্যেও আততির এ সত্য ভিন্নভাবে বিধৃত। জীবনানন্দের কাব্যরচনার ইতিহাসে এরই উদাহরণ, ঝরা-পালক-এর যুগ থেকে তাঁর শোকাবহ মৃত্যুর সময় অবধি। এমনকি তাঁর রচনারীতির অভ্যাসেও, মারিতাঁ যাকে বলেছেন হ্যাবিটেও এই কবিধর্মের বিশেষ আত্মপ্রকাশ। তাই তো জীবনানন্দ প্রেরণাবশত কবিতাটি লিখেই বিরত হতেন না, অনেক সময়েই তার মানসধৃত মৌলরূপের কাঠামোতে —হিউমের অর্থে—লৌহতন্ত্রীর মতো তাকে মেলাতে মেলাতে ক্লান্তিহীনভাবে

স্বকীয়তায়, আধুনিকতায়, পুনর্লিখিত করতেন। সুধীন্দ্রনাথও আমার কথায় সায় দিতেন নিশ্চয়ই, অন্তত উনিশশো আটাশ থেকে তাঁকে চেনায় এই আমার অভিজ্ঞতা। আর নাহলে কি ক'রে তন্বীর প্রথাসিদ্ধ প্রেমিক 'উটপাখী'র উত্তীর্ণ সার্থকতায় পৌছতেন ?

অমিয়বাবুর কাব্যবিকাশেও তাঁর বৈশিষ্ট্যানুসারে এই আধুনিকতার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। এইখানেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রভেদ। মোটা কথায় বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক এবং কয়েকটি মৌল পুরুষার্থে তাঁর আস্তিক্য নিশ্চিত যদিও প্রান্তিক থেকে শেষলেখায় কঠোর নগ্ন প্রশ্ন তাঁর মন তুলেছে—এবং শেষ অবধি শান্তিপারাবারে তাঁকে সংকুচিত হতে হয়নি আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। সে প্রকাশ যেমন বিরাট বিচিত্র তেমনি সুস্থ ও মহৎ। পরের কবিদের যে কারণেই হোক সে আত্মস্থতা হল দ্বিধান্বিত, প্রশ্নদীর্ণ, লজ্জিত, সংকুচিত। ব্যক্তি ও বহির্বিশ্বের সম্বন্ধের মননে যে দ্বন্দ্বময়তায় বা মার্কসীয় ভাষায় ডায়ালেকটিক্সে আত্মসচেতনতার তীব্রতা, সে ক্রান্তিময় সম্বন্ধেই এল যুগান্তর, এল জিজ্ঞাসু আত্মসংকোচন, যার ফলে কণ্ঠ হল কথ্যউচ্চারণের পক্ষে উপযুক্ত প্রাত্যহিক ; রূপক লেখার আত্মপ্রত্যয় আর রইল না, দিব্যবাণীর ঋষিসম্ভব নিশ্চিতি হল সুদূরপরাহত। মার্কিন কবি ওআলেস স্টীভনস্ এই মনের একটা চেহারা দেবার চেষ্টা করেছেন : 'আধুনিক কাব্য' নামক এক মজাদার কবিতায় :

> মনেরই কবিতা, মন যখন যা যথেষ্ট তাই খুঁজে পায়।
> চিরটাকাল তাকে এম্‌নিতর ক্রিয়ায় খুঁজতে হত না
> তাকে : মঞ্চ সেকালে সাজানো থাকত, মন শুধু
> আবৃত্তিতে প'ড়ে যেত লিপিতে যা লেখা।
>
> তারপরে থিয়েটার
> পালটিয়ে আরেক ব্যাপার হল। রইল অতীত তার স্মৃতিচিহ্নমাত্র।
>
> আজ তাকে জীবন্ত হতেই হবে, স্থানীয় বাচন শিখে।
> সমকালীন লোকের মুখোমুখি, চিনে জেনে
> একালের মেয়েদেরও। যুদ্ধের বিষয়ে তাকে ভাবতে হয়
> আর তাঁকে খুঁজে যেতে হয় যা যথেষ্ট তাই পেতে।
> তাকে এখন গড়তে হয় নব নাট্যমঞ্চ। আর সেই

মঞ্চে তাকে উঠে চিরতৃপ্তিহীন এক নটের মতন
ধীর স্থির ধ্যানময় কথা ব'লে যেতে হয়, যে কথাটি
কানে কানে, মনের পেলবতম কানে তোলে প্রতিধ্বনি
ঠিক তারই যা সে শ্রবণে উৎসুক, যার
ধ্বনিমাত্র শুনে অগোচর শ্রোতৃসভা কান পাতে,
নাটকে না, নিজেদেরই মনে, প্রকাশিত হয়েছে যা
একটি আবেগে যেন দুটি মানুষের, যেন দুটি আবেগের
একাত্ম হওয়ায়। এই অভিনেতা হন অন্ধকারে
বুঝি এক তত্ত্বজ্ঞানী তিনি তোলেন ঝংকার
কোনো যন্ত্রে, কঠিন তন্ত্রীতে ঝন্‌ঝনায় যাতে ফোটে
নানান আওয়াজ আচম্বিতে বহু খাঁটি সুরের লহরে
সর্বৈবরকমে মনটা আধৃত রেখে, যার নিচে নামতে
সে নারাজ, যার পারে ওঠার সংকল্প তার নেই।
তাকে যে পেতেই হবে
একটা পরমতৃপ্তি খুঁজে ; হতেও পারে তা : বরফে একটি লোক
চক্রিপায়ে ছোটে : হয়তো একটি মেয়ে নাচছে :
হয়তো বা কোনো মেয়ে
বেণী বাঁধে, এই মাত্র। মনের ক্রিয়ার কবিতাই॥

অনুবাদেও যাঁর অসামান্য প্রতিভা নিষ্প্রভ হয় না, সেই আধুনিক কবি বের্টোলট্‌ ব্রেখটের তথাকথিত এপিক নাট্যকাব্যের তত্ত্বও এই কথাই বলে, যদিচ ব্রেখটের অসমসাহসী আন্তর্জাতিক সভ্যতার পাশে স্টীভনসের মতো প্রাদেশিক মার্কিন কবি নিতান্তই ভীরুভব্য উচ্চশিক্ষাবিলাসী বিত্তবান ভদ্রলোক মাত্র। নাটকে যেমন পাত্রপাত্রী, তেমনি কবিতাতে—এমন কি গীতিপ্রবণ বাংলা কবিতাতেও তাই আসলে পুরুষার্থ আসে ব্যক্তি-ব্যক্তিতে, ব্যক্তি-সমাজে, ব্যক্তিবিশ্বে সম্বন্ধনির্ণীত এই ভঙ্গিমায়, বিন্যাসের বা, ক্লাইনেস্‌ অর্গাননের ভাষায়, গেস্ট্‌সের জগতের বাসিন্দা হ'য়েই। তাই ব্রেখটের কবিতায় সহজ গীতউচ্ছ্বাস তার উৎসে সরল নয় ; তাঁর নাটকে তথাকথিত নাটকীয় বাস্তবতা বা অপরপক্ষে অবাস্তবতার কুহকে পাঠককে বা দর্শককে ভোলাবার চেষ্টা থাকে না। অবশ্যই ব্রেখট স্বীয় প্রতিভার ট্র্যাজিক আয়রণিক প্রেমিক স্ফূর্তি

খুঁজে পান এক বেপরোয়া বোহিমীয়পনা থেকে মার্কসীয় দ্বন্দ্বোত্তরণে পৌঁছে। কিন্তু এই তত্ত্বেই মেলে মোটামুটি, কমবেশি আধুনিক, প্রগতিবিশ্বাসী—অথবা দুর্গতিবাদী—কাব্য-সাহিত্য শিল্পসংগীতের মূলসূত্র।

এই আধুনিক মানসিকতায় কবিতায় আর ব্যাখ্যা অংশের দরকার হয় না, আখ্যান যোজনারও নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যদি আবার এক 'উর্বশী' লিখতেন তাহলে লোকেন পালিতের যে শেষ স্তবকটির বিষয়ে আপত্তি ছিল সেটি লিখতেনই না, অথবা 'দুঃসময়' কবিতাতে বোধহয় শেষ স্তবকের ব্যাখ্যাটি নিষ্প্রয়োজনই থাকত। তাই আধুনিক কাব্যে কল্পপ্রতিমা রূপকীকৃত না হয়ে প্রতীকোৎসারী হ'য়ে ওঠে, অতিভাষী সুঁবোধ্যতার মসৃণ ময়দান ছেড়ে কবিতা বিহার করতে ওঠে মিতবাক্, হয়তো উচ্চাবচ, এমনকি হয়তো আপাত-দুর্বোধ্যতার পাথুরে জমিতে। একই কারণে কাব্যের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের চেয়ে ব্যক্তি-সমাজের নিহিত ভাষাবিনিময়ের আততিই হচ্ছে আধুনিক কাব্যের মৌলিক লক্ষণ। এবং যেমন এর নির্মাণের লৌহভিত্তি আত্মসচেতনতার অভ্যাসে গ্রথিত, তেমনি এর প্রত্যাশা হচ্ছে যে পাঠকও রাখবেন সচেতনতায় অভ্যস্ত সদাজাগ্রত মনন। বলা বাহুল্য এই আত্মসচেতনতা কবিতার জগতেই নিঃশেষ নয়। আধুনিক জগতের সর্ব ক্ষেত্রে আজ মননের এই বৈশিষ্ট্য—এখন পর্যন্ত মোটামুটি এক বোধহয় রাজনীতিতে ছাড়া। এবং সেইজন্যই আধুনিক কাব্য, আধুনিক শিল্পসংগীতের, বিজ্ঞানদৃষ্টির এত মূল্য। নিশ্চয়ই এর আতিশয্য ঘটে, বিকারও। সেই মারিতঁ্যাই তাই তাঁর এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে "ডিস্টর্শন" বা অতিভঙ্গ বিকৃতির কথা বলেছেন, আধুনিক শিল্পীরা অনেক সময়ে উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে বিকৃতি আনেন বিকৃতিরই শখে, সমগ্র চৈতন্যের প্রেরণায় বা গরজে নয়।

এবং মারিতঁ্যার এ বিচারে কোনো কোনো পাঠকের সম্ভবত গত দশ বারো বছরের বাংলা কবিতার আধুনিকতা খানিকটা পথভ্রষ্ট মনে হতে পারে, মনে হতে পারে বিকৃতির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টাকৃত, শুধুমাত্র চমক লাগাবার জন্য, বা বয়ঃসন্ধিশোভন নিজেকে নিয়ে ভিত্তিহীন নাটকীয়তার লোভে। অবশ্য বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা যে আত্মসচেতন অস্বস্তি বোধ করে, সেটা মোটেই তাদের পক্ষে ঝুটা নয়, কিন্তু তার কারণ ব্যক্তিগতভাবে সাময়িক অর্থাৎ আপতিক, মননের দিক থেকে গভীর নয়, মৌলিক নয়। অবশ্য ঐ অস্বস্তিই অনেক সময়ে সত্তাকে পরের পর্বে উত্তীর্ণ করে দেয়।

আধুনিকতার বিষয়ে উপরোক্ত একটা অস্পষ্ট ধারণা নিশ্চয়ই এই সংকলনের অবচেতনে ছিল। কিন্তু যেহেতু প্রথমত ধারণাটা সূত্রাকারে নির্দিষ্ট নয়, এবং যেহেতু গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের নানারকমে বাংলা কবিতার প্রগতির মোটামুটি একটা চেহারা সাধ্যমতো ধরাই ছিল এর বিনীত উদ্দেশ্য, সেহেতু এই বিচার ছিল একটিমাত্র বিবেচ্য। বরঞ্চ আমাদের ইচ্ছা ছিল এই চেহারাটা যত ব্যাপ্ত-ভাবে ধরা যায় তারই চেষ্টা করা। কিন্তু পূর্বোক্ত সীমানির্দেশের ফলে তাও সম্ভব হয়নি। এবং কোনো কোনো কবি যে হয়তো বা যথেষ্ট প্রচুরভাবে উপস্থাপিত হননি বা কারো কারো দীর্ঘ কবিতা বা কোনো কবিতাই যে আমরা শেষ অবধি অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি, তার কারণ বলাই বাহুল্য কবিতার কোনো বাছবিচার নয়; কারণটা, লজ্জার সঙ্গে স্বীকার্য, মার্কিনী ভাষায় যাকে বলে নিতান্তই প্রাগমাটিক।

সংকলনকার্য সম্ভব হয়েছে প্রকাশকের উৎসাহে, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদার্হ। আমার দুই সহকর্মী নবীন কবি-বন্ধু শ্রীমান প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের সহকর্মিতা ছাড়া মুদ্রণ বিষয়ে আমার মতো অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এই অসম্পূর্ণ সংকলনও সম্ভব হত না। অনুমতির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ও প্রমথ চৌধুরীর কবিতার জন্য "বিশ্ব-ভারতী"-র কাছে এবং কবিবন্ধুদের অথবা তাঁদের কবিতার স্বত্বাধিকারীদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। মুদ্রণ বিষয়ে শ্রীমান দুর্গাদাস সরকার ও শ্রীমান ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আমাদের বাধিত করেছেন। এবং বলাই বাহুল্য, 'নাভানা'র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের কবিতাগুলির অন্তর্ভুক্তিতে আমার আপত্তি সত্ত্বেও আমার দুই সহকর্মী নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেক্ষেত্রে আমি নাচার। কবিদের বয়স হিসাবে কবিতা সাজানোর ইচ্ছা থাকলেও সর্বদা তা সম্ভব হয়নি, এবং শ্রীযুক্তা লাবণ্য দাশ জানিয়েছেন জীবনানন্দের জন্মতারিখটি হবে ১৮৯৮—।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ — বিষ্ণু দে

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

পূর্ণতা

স্তব্ধরাতে একদিন   নিদ্রাহীন   আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে   অশ্রুনীরে   ধীরে মোর করতল চুমি—,
'তুমি দূরে যাও যদি,   নিরবধি   শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম   মরুসম   রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি   সব শান্তি   চিত্ত হতে করিবে হরণ—
নিরানন্দ নিরালোক   স্তব্ধ শোক   মরণের অধিক মরণ।'

শুনে, তোর মুখখানি   বক্ষে আনি   বলেছিনু তোরে কানে কানে,—
'তুই যদি যাস দূরে   তোরি সুরে   বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,   মোর চিত্ত   সচকিবে আলোকে আলোকে।
বিরহ বিচিত্র খেলা   সারাবেলা   পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,   দূরে গিয়ে   মর্মের নিকটতম দ্বার—
আমার ভুবনে তবে   পূর্ণ হবে   তোমার চরম অধিকার।'

দুজনের সেই বাণী,   কানাকানি,   শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা ;
রজনীগন্ধার বনে   ক্ষণে ক্ষণে   বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে   মৃত্যুরূপে   মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হল সারা,   স্পর্শহারা   সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,   ব্যথাময়   অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে   দীপ্তগীতে   সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন॥

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে।
নীরবে রয় অলস মন,
আঁধারময় ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বিপুল বিদ্রোহে।

কানন-'পরে ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।
যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনাদাহ বহে॥

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বনের মন্দির-মাঝে   তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল বহে যায়,   নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মন প্রাণ।

দেবতার বর
কত জন্ম, কত জন্মান্তর,
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে   লিখিছে আকাশ-পাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে   এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি   আমার উন্মনা আঁখি
এ-দেখার গূঢ় গান গাহে।

বোলে আজি তারে,—
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে   বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কতরাত্রে চৈত্রমাসে,   প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি   আমার গুণ্ঠনখানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ,—
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,   বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে   পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম   পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা॥'

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
'চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে, দুদ্দাড় জানালা দরোজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্‌ধাপ্‌।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেণ্টের দোল, যেন খ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্‌কুল ছোটে হন্‌হন্‌,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছট্‌ফট্‌,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।
ঘণ্টা কেবলি দোলে, ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ বাজে—
যত কেন বলা হোক তবু থামে না যে।
লক্ষ লক্ষ লোক বলে 'থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে, এ কী পাগলামো।'
কলিকাতা শুনে নাকো চলার খেয়ালে ;
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।
আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লি লাহোরে যাক, যাক্‌ না আগ্‌রা,
মাথায় পাগড়ি দেব, পায়েতে নাগরা।

কিম্বা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট-হ্যাট-কোটে।
কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই,
দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই॥

রঙ্গ

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন্‌পাপড়ি,
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি॥

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি,
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত,
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা,
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না,
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না॥

আফ্রিকা

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথানাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করেছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে।
দস্যু পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা,
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি;
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;
বলো, 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী

বাসাবাড়ি

এই শহরে এই তো প্রথম আসা ;
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি,
অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।
ধাঁধা ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে
দেখি, পথের বাঁ দিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে।
আঁধার-মুখোশ-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া,
হাঁ-করা-মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া।
চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।
বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি—কেউ বা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস ;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউ বা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।
শুধাই আমি, 'আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই।'
মনে হল জবাব এল, 'আমরা নাই নাই।'
সকল দুয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।
এক সঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, 'আমরা নাই নাই।'
আমি শুধাই 'কিসের কাজে এসেছ এইখানে।'
জবাব এল, 'সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদের দল ;
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপরেতে চাপা দিয়ে যাই—
নাই, নাই, নাই।'

পরের দিনে সেই বাড়িতে গেলেম সকালবেলা—
ছেলেরা সব পথে করছে লড়াই-লড়াই খেলা,
কাঠি হাতে দুই পক্ষের চলছে ঠকাঠকি।
কোণের ঘরে দুই বুড়োতে বিষম বকাবকি—
বাজিখেলায় দিনে দিনে কেবল জেতা-হারা,
দেনাপাওনা জমতে থাকে, হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রান্নাঘরের, শব্দ বাসন মাজার,
শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।
একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলায় 'আমরা নাই নাই ॥'

দেশান্তরী

প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের 'পরে,
আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশান্তরে।
দূর শহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে,
এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে
দুর্গা বলে বুক বেঁধে সে চলল ভাগ্য জয়ে,
মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে।
স্ত্রী দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে দুচোখ শুধু মোছে,
আজ সকালে জীবনটা তার কিছুতেই না রোচে
ছেলে গেছে জাম কুড়োতে দিঘির পাড়ে উঠি,
মা তারে আজ ভুলে আছে তাই পেয়েছে ছুটি।
স্ত্রী বলেছে বারে বারে, যে করে হোক খেটে
সংসারটা চালাবে সে, দিন যাবে তার কেটে।
ঘর ছাইতে খড়ের আঁটির জোগান দেবে সে যে,
গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে
মাঠের থেকে খড়কে কাঠি আনবে বেছে বেছে,
ঝাঁটা বেঁধে কুমোরটুলির হাটে আসবে বেচে।

ঢেঁকিতে ধান ভেনে দেবে বামুনদিদির ঘরে,
খুদকুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে দুর্বছরে।
দূর দেশেতে বসে বসে মিথ্যা অকারণে
কোনোমতেই ভাবনা যেন না রয় স্বামীর মনে।
সময় হল, ওইতো এল খেয়াঘাটের মাঝি,
দিন না যেতে রহিমগঞ্জে যেতেই হবে আজি।
সেই খানেতে চৌকিদারি করে ওদের জ্ঞাতি,
মহেশখুড়োর মেজো জামাই, নিতাই দাসের নাতি।
নতুন নতুন গাঁ পেরিয়ে অজানা এই পথে
পৌঁছবে পাঁচদিনের পরে শহর কোনোমতে।
সেইখানে কোন্ হালসিবাগান, ওদের গ্রামের কালো,
সর্ষেতেলের দোকান সেথায় চালাচ্ছে খুব ভালো।
গেলে সেথায় কালুর খবর সবাই বলে দেবে—
তারপরে সব সহজ হবে, কী আর হবে ভেবে।
স্ত্রী বললে, "কালুদাকে খবরটা এই দিয়ো,
ওদের গাঁয়ের বাদল পালের জাঠতুত ভাই প্রিয়
বিয়ে করতে আসবে আমার ভাইঝি মল্লিকাকে
উনত্রিশে বৈশাখে॥"

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদি বিশ্ব ঠাকুরমায়ের আসমানি এক চেলা
ঠিক দুক্ষুর বেলা।
বেগুনি-সোনা দিক-আঙিনার কোণে
বসে বসে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে

ঘুম-লাগা রোদ্দুরে
ঝিমঝিমিনি সুরে,
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখিনে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত,
এই কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুকরো করে ওড়ার ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।

হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে,
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ওই যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি,
কদিন হল জানিনে কোন্‌ গোঁয়ার খুনি
সমথ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্‌ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে,
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার', বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়॥

সানাই

সারারাত ধ'রে
গোছা গোছা কলাপাতা আসে গাড়ি ভ'রে
আসে সরা খুরি
ভুরি ভুরি।

এ পাড়া ও পাড়া হতে যত
রবাহূত অনাহূত আসে শত শত ;
প্রবেশ পাবার তরে
ভোজনের ঘরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠেলাঠেলি করে ;
বসে পড়ে যে পারে যেখানে
নিষেধ না মানে।
কে কাহারে হাঁক ছাড়ে হৈ হৈ,
এ কই, ও কই।
রঙিন উষ্ণীষধর
লালরঙা সাজে যত অনুচর
অনর্থক ব্যস্ততায় ফেরে সবে
আপনার দায়িত্বগৌরবে।
গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায় ;
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায় ;
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিস।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।

সমস্ত এ ছন্দ-ভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।

অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্যলোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।
বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়,
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে,
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।

কতবার মনে ভাবি, কী যে সে কে জানে।
মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু-পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি ;

মনে ভাবি, এই সুর প্রত্যহের অবরোধ 'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই ;
মনে যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে ॥

শ্রাদ্ধ

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে ;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাকটিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই ;
হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, 'ভয় নাই।'
সে বলে, 'সব বাজে কথা, খাবার জিনিষ খাদ্য।'
দশদিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারই শ্রাদ্ধ।
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচা তেঁতুল দরকার,
বেগুন-মুলোর সন্ধানেতে ছুটল ন্যাড়া সরকার।
বেগুন-মুলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে,
নগদ দামে বিক্রি করে, তিন টাকা দাম হাজারে।
ডুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল, বানিয়ে দেবে মুড়কি ;
সন্দেহ হয়, ওজন মতো মিশল তাতে গুড় কি।
সর্ষে যে চাই মন দু-তিনেক ঝোলে ঝালে বাটনায় ;
কালুবাবু তারি খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
তারি সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গম-ভাঙানির খুদ।

ওই শোনা যায় রেডিওতে বোঁচা গোঁফের হুমকি ;
দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুমকী।
খাঁচায়-পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে ;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে ॥

বালুর চরে আলুহাটা, হাতে বেতের চুপড়ি,
খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মুলো নিল উপড়ি।
নদীর পাড়ে কিচির-মিচির লাগালো গাঙশালিক যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলোখেতের মালিক যে।
কাঁকুড় খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি ;
কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্র লেখা উল্কি-দেওয়া আঁকনটা।
কুচো মাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে—
মেছুনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ওপারেতে খড়্গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুনশিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।
রেডিওতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হুইস্‌ল্ দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার ;
মাথায় মোছে হাতের কালি, সময় না পায় নাইবার।
ননদ গেল ঘুঘুডাঙায়, সঙ্গে গেল চিন্তে ;
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাটাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল খোঁজাই।

ননদ পরল রাঙা চেলি, পালকি চড়ে চলল,
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে, গায়ে হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
জমাদারের মামা পরে শুঁড়-তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাৎ খটাৎ,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।
খয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা;
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়—যমালয়ের পয়দা।
আকাশ থেকে নামল বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়—
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস্ দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইস্‌ল্ বাজে ইস্টিশনে, বরের জ্যাঠামশাই,
চমকে ওঠে—গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায়রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে লেজ দুলিয়ে নাচে—
শুধোয় নাচন, 'সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে।'
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে;
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলা ব্যাঙ,
খড়্গপুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাডাঙড্যাঙ।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা কলমিপাড়ের পুকুর,
জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়াল কাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।
গ্যাগোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত;
মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।

টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে—
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।

দিন চলে যায় গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া;
শান-বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মউ,
হীরেদাদার মড়্‌মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।
পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে—
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড় পুতুলের বিয়ে;
বাঁধা বুলি কুকরে উঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পান্তি হাতে বেতো ঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।
তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হুড়মবিবির গলাতে সাত-পুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয়-পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির নয় সে পরিষ্কার,
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুইধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-ঘুনে-ফুক্‌রো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে
লোকে বলে, "সত্যি নাকি!"—ঘুমোয় বলতে বলতে।

সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলটপালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে ;
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতে হতেছে ক্রোশ পার।
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এস্‌পার ওস্‌পার ॥

ধূসর গোধূলিলগ্নে

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ ;
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে ॥

ওরা কাজ করে

অলস সময় ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল ;
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।

শূন্য পথে চাই,
আজ তার কোন চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্য তলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি, সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে ;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ;

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন, গুন্‌গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শতশত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে॥

রূপ-নারানের কূলে

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম ;
জানিলাম, এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ ;
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে॥

প্রথম দিনের সূর্য

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর॥

প্রমথ চৌধুরী

(১৮৬৮-১৯৪৬)

সনেট

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ !

নীরব কবিও ভালো, মন্দ শুধু অন্ধ।
বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,

তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ।

ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

ইতালির ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!

পত্রলেখা

অষ্টাদশ বর্ষ দেশে আছ পত্রলেখা!
শুক-মুখে শুনিয়াছি তোমার সন্দেশ।
তাম্বুল-করঙ্ক করে, রক্ত পট্টবেশ,
প্রগল্‌ভ বচন, রাজ-অন্তঃপুরে শেখা।

কাব্য-রাজ্যে তব সনে নিমেষের দেখা।
সুবর্ণ-মেখলা-স্পর্শী মুক্ত তব কেশ—
অশ্বপৃষ্ঠে রাজপুত্র যায় দূর দেশ,
অঙ্কে তার আঁকা তুমি বিদ্যুতের রেখা!

চন্দ্রাপীড় মুগ্ধনেত্রে হেরে কাদম্বরী—
রক্তাম্বরে রাখ তুমি হৃদয় সম্বরি।

গিরি পুরী লঙ্ঘি, সিন্ধু কান্তার বিজন,
মনোরথে নীলাম্বরে ভ্রমি যবে একা—
মম অঙ্কে এসে বস, কবির স্বজন,
তাম্বুল-করঙ্ক করে তুমি পত্রলেখা!

ত্রিওলেত

উষা

উষা আসে অচল শিয়রে
তুষারেতে রাখিয়া চরণ।
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে,
উষা হাসে অচল শিয়রে,
ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বোসো সখি মনের শিয়রে
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।

মধ্যাহ্ন

আকাশের মাটি-লেপা ঘরে
রবি এবে দেয় আল্‌পনা।
দেখো সখি মেঘের উপরে
কত ছবি আঁকে রবিকরে।
কত রঙে কত রূপ ধরে
ছবি যেন কবি-কল্পনা।
বুক মোর আছে মেঘে ভরে
তাহে সখি দাও আল্‌পনা।

সন্ধ্যা

দেখো সখি দিবা চলে যায়
লুটাইয়া আলোর অঞ্চল,
পিছে ফেলে অবাক নিশায়
দেখো সখি আলো চলে যায়।
বিশ্ব এবে আঁধারে মিশায়,
তাই বলে হোয়ো না চঞ্চল।

বেলা গেলে সবে চলে যায়
গুটাইয়া আলোর অঞ্চল।

মধ্যরাত্রি

দেখো সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্র তারা।
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে,
আঁধারের রহস্যের টানে
দুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রাখো সখি জ্বেলে মোর প্রাণে
আলো ভরা দুটি কালো তারা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৭১-১৯৫১)

পাল্কীর গান

চলে চলে
        হুম্‌কিতালে
            পংখী গালে
                মাসিপিসি
                    বাঘ্ বেরালে।
ভুত্‌পেরেতে
        চলছে রেতে
            হনহনিয়ে
                ভুত্‌পেরেতে।

পাল্কী দোলে
উঠ্‌তি আলে
নাল্‌কি দোলে
নাম্‌তি খালে।

আলো আঁধারে
শেওড়াগাছ
কালোয় সাদায়
বেরাল নাচ।

মরানদী
বালির ঘাট
মন্‌সাতলায়
মাছের হাট।

ভুতের জমি
ভুতের জমি
ভুত্‌পেরেতের
নাইকো কমি।

উড়ছে কতক
ভন্‌ভনিয়ে
চলছে কতক
হন্‌হনিয়ে
হঁন্‌হঁনিয়ে

ঢুল্‌ছে কতক
গাছতলাতে
তুল্‌ছে কতক
তাল্‌পাতাতে

দিন্‌দুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাত দুপুরে
হুতুমথুমোয়।

ভোঁদড় ভাম
বেঙ-বেঙাচি
টিকটিকি আর
কানামাচি।
গঙ্গাফড়িং
জোনাক পোকা
আরসোল্লা
ন্যাংটা খোকা।
ছুঁছো ইঁদুর
খ্যাঁকশেয়াল
শুক্‌নো পাতা
গাছের ডাল।
সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
ঘূর্ণি-হাওয়ায়
চল্‌ছে ঘুরে
জগৎজুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুল্‌ছে কুলো!
সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে
সব ভুতুড়ে
ভুতের খেলা
খেজুরতলায়
ইঁটের ঢেলা ...

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৮২-১৯২২)

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে! পাল্কী চলে!
গগন-তলে আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে ঢুল্‌ছে ক'সে!
দুধের চাঁছি শুষছে মাছি,—
উড়ছে কতক ভন্‌ভনিয়ে।—
আসছে কা'রা হন্‌হনিয়ে?
হাটের শেষে রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো শুঁক্‌ছে ধুলো,—
ধুক্‌ছে কেহ ক্লান্ত দেহ।
ঢুক্‌ছে গোরু দোকান-ঘরে,
আমের গন্ধে আমোদ করে!

পাল্কী চলে, পাল্কী চলে—
দুল্‌কি চালে নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,—জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে আগ্ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে তামার টাটে!
তপ্ত তামা,—যায় না থামা,—

উঠ্‌ছে আলে নাম্‌ছে গাড়ায়,—
পাল্কী দোলে ঢেউয়ের নাড়ায়!
ঢেউয়ের দোলে অঙ্গ দোলে!
মেঠো জাহাজ সাম্‌নে বাড়ে,—
ছয় বেহারার চরণ-দাঁড়ে!

কাজ্‌লা সবুজ কাজল প'রে
পাটের জমি ঝিমায় দূরে!
ধানের জমি প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে কাঁটার বেড়া!
'সামাল' হেঁকে চলল বেঁকে
ছয় বেহারা,—মর্দ তারা!
জোর হাঁটুনি খাটনি ভারি;
মাঠের শেষে তালের সারি!

তাকাই দূরে, শূন্যে ঘুরে
চিল্ ফুকারে মাঠের পারে।
গোরুর বাথান,—গোয়াল-থানা,—
ওই গো! গাঁয়ের ওই সীমানা!
বৈরাগী সে,—কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে লেপ্‌ছে কাদা;
মট্‌কা থেকে চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে,—ডাগর চক্ষু মেলে!
দিচ্ছে চালে পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির মূর্তি শুচি।

পেরজাপতি হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি বাসন মাজে?—
পুকুর-ঘাটে ব্যস্ত কাজে;—

এঁটো হাতেই হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার কাপড় গোছায়!
পাল্কী দেখে আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—মাথায় পুঁটে!

পোড়োর আওয়াজ যাচ্ছে শোনা;—
খোড়ো ঘরে চাঁদের কোণা!
পাঠশালাটি দোকান-ঘরে,
গুরুমশাই দোকান করে!

পোড়ো ভিটের পোতার 'পরে
শালিক নাচে, ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে অশথ-তলে
বুনোর ডেরায় চুল্লী জ্বলে;
টাট্‌কা কাঁচা শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কী মাঠে নামল ধীরে;
আবার মাঠে,—তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ কষ্টে হাঁটে;
মাঠের মাটি রৌদ্রে ফাটে,
পাল্কী মাতে আপন নাটে
শঙ্খচিলের সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে মেঘ চলেছে!
তাতারসির তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার দেয় হরষে!
গঙ্গাফড়িং লাফিয়ে চলে;
বাঁধের দিকে সূর্য ঢলে।

পাল্কী চলে রে! অঙ্গ ঢলে রে!
আর দেরি কত? আরো কত দূর?
"আর দূর কি গো? বুড়ো শিবপুর
ওই আমাদের; ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কী চলে রে, অঙ্গ টলে রে,
সূর্য ঢলে, পাল্কী চলে!

যক্ষের নিবেদন

মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কইগো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও;
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও— অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক,
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্;
গ্রীষ্মের হোক শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ!

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন্ কোন সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাইতো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাইতো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায়;

ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য ! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপা-লেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক চোখ ;
চঞ্চল খঞ্জন-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ্ !

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই, নাই সুখের লেশ,
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও ;
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক্," বন্ধু ! বন্ধুর আশিস্ লও ॥

জাতির পাঁতি

(অংশ)

জগৎ-জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো ক'রে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র,
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।

জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের ভেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে!
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি,
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
অমেয় শকতি মোদের আজি।
আজি নির্মোক মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।
পরিবর্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে!

গোত্র-দেবতা গর্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,
আর তুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি।
আসিছে সে দিন আসিছে সে দিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্মে
মনুর ধর্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির-স্রোতে,
জগতের যত তূর্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে!
মহান যুদ্ধ মহান শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা, শুধু রাজার ভৃত;
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষেত্রে
বনেদ হয়েছে অমজবুত।
নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
সকল রথীর সেরা সে রথী।

বঙ্গে ঘরানা কৈবর্তেরা,
বামুন নহে গো—কায়েতও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত রাজার
যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।
এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয় ;
হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
তার চেয়ে ভালো বলাই হাড়ী,
যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি,
ধর্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে,
পৈতা তো সিকি পয়সার সুতা
পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
রইদাস মুচি, সুদীন কসাই,
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,
মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে।
চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
নহে গো এ নহে উপন্যাস।
নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
ডোম আর যুগী হেলার নহে,
মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের
কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।
মদের তৃষ্ণা শুঁড়ীরে গড়েছে
মিছে তারে হায় গণিছ হেয়,

তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী
তা হ'লে সবাই অপাঙ্‌ক্তেয়।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,
আদি জননীর পুত্র সবে,
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে?
বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাট্‌নী, কোটাল, কপালী, মালো
বামুন, কায়েত, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি, সমান ভালো;
বেনে, চাষী, জেলে ময়রার ছেলে,
তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয়;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকার তার মাল্য জোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করেছে ধনী,
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান তার ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।

ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।
সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবারে জলে,
সহজ সবল সরস ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।
ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া।
তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাস-ভরা
দিকে দিগন্তে পাগল গানে ;
গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
মাতেরে হৃদয় পরাণ মাতে,
গো-ত্র আঁকড়ি গোরুরা থাকুক
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।
জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
সাথীবলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমাশান্তি
এসেছে শঙ্খ-চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে।

রিক্তা

মালিনী ছন্দের অনুকরণে

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে ?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্তি চূর্ণ,
বেলা চলে গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ ॥

ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম।

কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম্।
ইল্‌শে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দুরে রিম্‌ঝিম্।

হালকা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।
কেউ বা নাচে জলের তলায়,
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায়;
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপগাছ।
উলসে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?
ঝুম্‌রো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে!
ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে উঠে বাড়িয়ে মুলো;
ব্যাঙ্ ডাকে ওই গলাফুলো,
আকাশ গলেছে;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে।

মেঘায় মেঘায় সূর্যি ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,

ঢাক্‌লো মেঘের খুঞ্চেপোষে
তাল-পাটালির থাল !
লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে,
তাল্‌-বড়া দাও তাদের পাতে
টাট্‌কা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশি তৈরী ক'রে
দিয়ো তাদের কাল।
খেজুর পাতার সবুজ টিয়ে
গড়তে পারে কে ?
তালের পাতার কানাই-ভেঁপু
না হয় তারে দে !
ইল্‌শে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি—
ঝরছে কত,—বলব তা কী ?
ভিজতে এল বাবুই পাখি
বাইরে ঘর থেকে ;—
পড়তে পাখায় লুকালো জল
ভিজলো নাকো সে !

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
পরীর কানের দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ঝুরো কদম ফুল।
ইল্‌শে গুঁড়ির খুন্‌সুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,
নেবু ফুলের কুঞ্জটিতে
দুলছে দোদুল দুল ,
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল ॥

বিদ্যুৎ-বিলাস

শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের অনুকরণে

সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়্‌ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ!
ঝঞ্ঝার দোল
সারা সৃষ্টিময়,—
জাগে প্রলয়;
তাণ্ডব্ বিভোল্—
ছায় দ্যুলোক।

বৃষ্টির স্রোত
করে বিশ্ব লোপ;
নিয়েছে খোপ—
নিশ্চুপ কপোত
নিশ্চপল;
পর্জন্যের
চলে শূন্যে রথ,—
ধ্বনি মহৎ;
নির্জন্ নীপের
কুঞ্জতল।

সূর্যের নাম
হল শব্দ-শেষ,
প্রতি নিমেষ—
তন্দ্রার ত্রিযাম
অন্ধকার!

মেঘ-মল্লার
শত ঝিল্লি গায়,
যূথীলতায়
চুম্বন বিথার
অপ্সরার !

দেব-ঝর্ণার
জলে জলসা আজ
ধরণী-মাঝ,
কিন্নর বীণার
উঠ্‌ছে তান ;
অঞ্জন্‌-মেঘ
চলে ঐরাবৎ
জুড়ি' জগৎ,
ঝঞ্ঝার আবেগ
ছায় পরাণ !

ইন্দ্রের ধন
হের পৃথ্বীছায়—
সোনা বিছায়,
বর্ষার স্বজন
দিক ছাপায় !
অঙ্কুর তার
ত্যজে গর্ভবাস
ফেলে নিশাস—
ভুঁই-ভাগ আবার
ভুঁইচাঁপায় ।

ঝাপসার রূপ
শুধু পষ্ট আজ
ভুলাল কাজ

মৌনের অনুপ
মূর্ছনায়
শষ্পের গান
ভ'রে তুল্‌ছে মন
সারাটি ক্ষণ
বাষ্পের বিতান
রস ঘনায়।

বিদ্যুৎ-ঠোঁট
হানে ধূম্র-চূড়
ঝড়-গরুড়,
পাখ্‌সাট আচোট
বন লোটায় ;
গর্জন, গান,
মেশে হর্ষ, খেদ,—
পাশরি ভেদ ;
বজ্রের বিধান
ফুল ফোটায় !

বজ্রের বীজ
ফেরে রাত্রি দিন
করে নবীন,
মৃত্যুর কিরীচ্‌
প্রাণ বিলায় !
বিস্ময়, ভয়,
মেশে হর্ষে, আজ,
রাজাধিরাজ
রুদ্রের সদয়
দান-লীলায় !

সুকুমার রায়

(১৮৮৭-১৯২৩)

ট্যাঁশ গরু

ট্যাঁশ্ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে ;
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।
চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।
তিন-বাঁকা শিং তার, ল্যাজখানি প্যাঁচান—
একটুকু ছোঁও যদি, বাপ্‌রে কি চ্যাঁচান!
লট্‌খটে হাড়গোড় খট্‌খট্ ন'ড়ে যায়,
ধম্‌কালে ল্যাগ্‌ব্যাগ্ চমকিয়ে প'ড়ে যায়।
বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার,
চেহারার কি বাহার—ঐ দেখ ছবি তার।
ট্যাঁশ্ গরু খাবি খায় ঠ্যাস দিয়ে দেয়ালে,
মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে না জানি কি খেয়ালে ;
মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে রেগে যায়,
মাঝে মাঝে কুপোকাৎ দাঁতে দাঁত লেগে যায়।
খায় না সে দানাপানি—ঘাস পাতা বিচালি,
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি ;
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে,
সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্‌খক্,
সারা গায়ে ঘিন্‌ঘিন্ ঠ্যাং কাঁপে ঠক্‌ঠক্।
একদিন খেয়েছিল ন্যাকড়ার ফালি সে—
তিন মাস আধমরা শুয়েছিল বালিশে।
কারো যদি সখ্ থাকে ট্যাঁশ্ গরু কিন্‌তে,
সস্তায় দিতে পারি, দেখ ভেবে চিন্তে॥

ছায়াবাজী

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি ?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি !
শিশির-ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুরবেলায় আকাশ-পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া তাও দেখেছি চেটে !
কেউ জানে না এ-সব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছুপিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভূঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে ;
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো,
বলছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্‌রে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।

আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়,
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে,
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি সস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি॥

আবোলতাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আব্ছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশার ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে

ছুট্‌লে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্‌ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট্‌ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্‌
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্‌।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত !
হ্যাংলা হাতি চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর.
গানের পালা সাঙ্গ মোর॥

মোহিতলাল মজুমদার

(১৮৮৮-১৯৫২)

কামনা

সবুজ বোঁটায় সব দলগুলি তুলাইব থরে থরে,
মধু-পিপাসায় রঙের নেশায় ভুলাইব মধুকরে ;
সার্থক হবে ক্ষণ-সৌরভ অসীম অর্থভরা,
মনোবীজরাশি ছড়াইব আমি নব-নবীনের তরে।

মাটির পৃথ্বী বিদারণ করি' শত মুখে শত রস
স্নায়ুতে-শোণিতে শুষিয়া লইব, হোক তায় অপযশ!
হৃদয়ে আমার যত সাধ আছে ফুটাইব শতদলে,
জীবন-সায়রে ফুটিয়া উঠিব অপরূপ তামরস!

আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীম রাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি!
ধরার কুসুম বার বার হাসে, বার বার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী

দিনশেষে

লাল হ'য়ে ঐ নীল নভ-তল সোনালি হয় যে শেষে—
যেন নেবু-রঙ ওড়্না খসিছে রজনীর কালোকেশে!
সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুময়,
দিনশেষে তবু কেন মনে হয়—
এখনো যেটুকু রয়েছে সময়
লই মোরা ভালোবেসে,
এস, কাছে এস, চুম্বন করি সুগন্ধ কালোকেশে।

দিন যে ফুরালো, রবে না এ আলো, আসিছে নিশুতি রাতি—
সে আঁধারে সখি কেহ যে হবে না কাহারো বাসর-সাথী!
নিশীথ আকাশে আসিবে যে তারা,
চির-তিমিরের প্রহরী তাহারা,
চোখে-চোখে শুধু করিবে ইসারা
সে কি কৌতুকে মাতি'—
এত প্রেম, প্রাণ—সব নির্বাণ! শেষ এল সেই রাতি!

এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু—কত রঙ, কত রূপ!—
হায় সখি, হায়! ও রাঙা অধর করে যেন বিদ্রূপ!
শত যুগ ধরি' রূপসী বসুধা
মিটাইতে নারে অসীম যে ক্ষুধা—
এক যৌবনে ফুরাবে সে সুধা?
—তারি পরে যম-যূপ!
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ, এত রূপ!

রূপ যে অশেষ! যুগ-যুগান্ত এমনি অটুট রবে,
হেথাকার ফুল এমনি ফুটিবে মৃদু মধু সৌরভে!
আমাদের মত কত বিহঙ্গ,
কত বিচিত্র ক্ষণ-পতঙ্গ
লভি' তার সেই রূপের সঙ্গ
বসন্ত উৎসবে,
লইবে বিদায় ধরণীর ফুল এমনি ফুটিয়া রবে!

তবু সেইটুকু মধু-পার্বণ হেলা করি' কেটে যায়!
মধু-হ্রদ হতে একটি কণিকা শুষিতে সে ভয় পায়!
ঊষালোকে হেরে সন্ধ্যার ছায়া,
দিবস-দুপুরে কত প্রেত-কায়া!—
হায় সখি, একি নিদারুণ মায়া,
একি বাধা পায়-পায়!
চির-নিশীথের একটি সে দিবা ভয়ে ভয়ে কেটে যায়!

অসীম ক্ষুধার একটু সে সুধা যে করে পুলকে পান,
সে যে জীবনের বনে বনে পায় সুমধুর সন্ধান!—
মাটি ফেটে ফোটে নামহারা ফুল,
লতার বিতানে দোলে এলোচুল,
পাতায় পাতায় লিপি সে অতুল—
বায়ু-মর্মর গান!
সারা জীবনেও হেন মধুবনে ফুরায় কি সন্ধান?

দিনশেষে তাই নয়নে আমার উথলে অশ্রুজল,
কবরী খুলিয়া ওই কেশপাশে মুছাও কপোলতল।
বক্ষে আমার রাখ হাতখানি,
গুঞ্জর' কানে পরমা সে বাণী—
'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি
তবু নহে নিষ্ফল—
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোরা এক ফোঁটা আঁখিজল'।

এই যে তুলিনু মুখখানি হাতে, চাও দেখি মুখে মোর,
আর একবার—শেষবার—চোখে লাগুক নেশার ঘোর!
ভুলি' যাও ব্যথা—বৃথা কলঙ্ক!—
সলিলের তলে আছে যে পঙ্ক;
তুমি খুলে ধর মধু-করঙ্ক
আপন গন্ধে ভোর,
কালো হয়ে আসে নীল বনরেখা, রাখ এ মিনতি মোর!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১৮৮৮-১৯৫৪)

ঘুমের ঘোরে

'প্রথম ঝোঁক' থেকে

এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা;
তোমায় আমায় হ'য়ে যাক দুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি!

পৃথিবী ঘুরিছে বেমালুম যেন মাখম-মাখানো পথে,
ছোট বড় কত টানে অবিরত টলে না সে কোন মতে।
সৃষ্টি চমৎকার—
ঠোকাঠুকি নাই, গতি-বিজ্ঞানে বাঁধা আছে চারিধার।
সে দিন বন্ধু পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া,
লোহা-বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া!
দেখি চলিবার কালে,
গতি-বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে।

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
'ঠাকুরের, আহা! অপার করুণা' কেঁদে কেঁদে তারা বলে;
'দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতি মাত্রায় সূক্ষ্ম।'
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হল কতটুক!
একাকী ফিরিনু ঘরে,
প্রাণের দুঃখ যায় না কিছুতে, আঁখি আসে জলে ভরে!
ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
'প্রাণের দুঃখ না যাক কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।'
বন্ধু, প্রণাম হই,—
শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঃঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম।
সেই জুড়াবার ঠাঁই;
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
যুগ যুগ ধ'রে কেন এ প্রয়াস গরমিলে মিলাইতে।
কোন যম নাই হিসাব করিয়া সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা;
এ জগৎ মাঝে সেই তত সুখী, যার গায়ে যত ঘাঁটা!

বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হয়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা !
আমি বলি, কিনে কুলো—
পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দুকানে গুঁজিয়া তুলো ।

কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর ? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাটিতে কেন চোখে মার খোঁচা !
জানি তুমি ভাল ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে !
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে ?
সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি আন ডালা ভরি ;
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে 'তাঁর অপার করুণা, মরি ।'
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
'গোরু মেরে জুতা দান' অপেক্ষা নহে কভু বেশি পুণ্য !

পাষাণ-প্রতিমা

হিমাদ্রির কোন শৃঙ্গ হ'তে কবেকার তুষারঝঞ্ঝায়
পড়িনু খসিয়া
খরস্রোত গিরিদরীজলে ;
কতকাল ঘৃষ্ট পিষ্ট হ'য়ে কোন্ এক বিক্লান্ত সন্ধ্যায়
ঠেকিনু আসিয়া
বনান্তের শালতরু-তলে ?
আজ কিছু নাহি পড়ে মনে ; জাগিলাম প্রথম যেদিন,
চারিদিকে মোর
জ্বলিতেছে লক্ষ দীপ-মালা ;

বাজিতেছে শঙ্খ ঘণ্টা কাংস, চক্ষে মোর পলকবিহীন
ধূপধূম-ঘোর ;
চরণে চন্দন ফুল ঢালা।
শত বিপ্র বেদমন্ত্রগীতে করিছে বন্দন স্তবপাঠ,
গলবস্ত্রে রানী
প্রণতি করিছে রাজাসনে,
মোর চেয়ে সুন্দর পাষাণে, গঠিয়াছে মন্দির বিরাট,
পাদপীঠখানি
খচিয়াছে মণিআভরণে।

সেই দিন হ'তে রাত্রিদিন সম্বোধিল দেবতা বলিয়া
লক্ষ নরনারী ;
পাইলাম কত প্রাণ-বলি।
সেই প্রাণে প্রাণ পেয়ে যেন কে জাগিল পাষাণ ঠেলিয়া,
রক্তে ভরে নাড়ী,
ত্রিনয়নে জ্যোতি উঠে ঝলি।
ছুটে আসে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ব্যথাহত কত না মানব ;
স্মরি মোর নাম
রাজা সবে ভায় অন্নজল।
ভক্তিভরে আমারে প্রণমি অশ্রুজলে করি মোর স্তব
শান্ততৃপ্ত-কাম
চলে যায় ভিখারীর দল।

একদিন ধূসর সন্ধ্যায় ক্ষুধাখিন্না শীর্ণা মহামারী
তীক্ষ্ণ জিহ্বা মেলে
দেখা দিল দিগন্তের তীরে ;—
দানবীর সে ক্ষুধা মিটাতে দলে দলে মরে নরনারী ;
ঘরদ্বার ফেলে
এল ছুটে আমার মন্দিরে।

লক্ষ নিরুপায় কণ্ঠ যাচে প্রাণ চাহি মোর পানে,—
উর্ধ্বে কর তুলি
ভীত সবে দিলাম অভয় ;
মানবের হৃদয় আসিয়া ক'রেছিল দেবতা পাষাণে
তাই প্রাণ খুলি
বলিলাম নাহি নাহি ভয় ।
শিলাময় চারি হস্ত মেলি সকলেরে লইলাম টানি
করুণায় কাঁপি
মণিস্নিগ্ধ শিলাময় বুকে ;
জননী জেগেছে প্রাণে পশি কানে সন্তানের বাণী,
ধরিলাম চাপি,
তীব্রতম স্নেহস্পর্শসুখে !
ছাড়িলাম যবে, দেখি চেয়ে—রাজ্য রাজা চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে
শূন্যে গেছে উড়ে—
আমার সে স্নেহ-আলিঙ্গনে ;—
জাগিয়াছে নিবিড় কানন, নদী কাঁদে, বায়ু আসে ধেয়ে ;
এ শ্মশানপুরে
একা জাগি বটের বেষ্টনে ॥

অপমান

দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো বন্ধু !
সে নিষ্ঠুরতাও ক্ষমিতে পারি,
গভীর দুখও যে ভুলাইয়ে দাও—
এই অপমান সহিতে নারি ।
দুখী আত্মার দুঃখই মান,
সে সম্মান সে হারাল যদি,
দুখিনী মায়ের কাঁথা ভুলাইল
ধনী শ্বশুরের আরাম-গদি,

করি প্রাণপণ যে দুখ-মোচন
দুর্ভাগাগণ করিতে নারে
মায়া বুলাইয়ে তুমি সে দুখের
স্মৃতিটুকু যদি ভুলাও তারে,
বলাও তাহারে যুক্ত করেতে—
'ধন্য হে প্রভু ধন্য তুমি,
অমন ব্যথাও ভুলে যেতে দাও,
হে দয়াল তব চরণ চুমি,'
তবে বল তার কি থাকে বাকি ?
মানুষ যে হয়, সে কি কভু চায়
মদের আড়ালে বেদনা ঢাকি ?
দুঃখের বোঝা বহিতে না পারি,
তার মান রেখে মরিতে পারি ;
ওই দয়া তব, ওই মায়া তব,
ওই পরিহাস সহিতে নারি।

চিরবিদ্রোহী মানব-আত্মা—
আজিও তোমার মানেনি বশ,
জনে জনে তারা বিশ্বামিত্র
হরিতে বিশ্বকর্মা-যশ।
কাম পুড়াইয়ে সৃজিয়াছে প্রেম,
দেহ মথি' তারা তুলেছে স্নেহ ;
মনের ফানুস ছেড়েছে আকাশে,
আকাশ বাঁধিয়া গড়েছে গেহ।
এ জগতে তব স্বেচ্ছাতন্ত্র,—
তাই নর তার জবাব দিতে
গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতরে
প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।
মরণ-বারণ রসায়ন লাগি'
আজিও তাহার চলিছে তপ,

দুঃখ-তারণ মন্ত্র-কারণ
ওঙ্কার-সাথে সোহং-জপ !
হিংসা ভাসায়ে দয়ার প্লাবনে,
সংযমে রিপু করেছে জয় ;
আপন হাতের কর্মের ফাঁসে
কর্ম কাটিয়া করেছে ক্ষয় ।
রাজা অনায়াসে ত্যজিয়াছে রানী,
যুবরাজ হ'ল কানন-বাসী ;
কারা-বন্ধনে মার ক্রন্দনে
অসি ধরে ছেলে ত্যজিয়া বাঁশি ।
পরিবর্তিতে তব বিধান,—
শিরে অপমান-কাঁটার মুকুট—
মহাপ্রাণ ক্রুশে ত্যজেছে প্রাণ !
আজিও ত নর অপরাজিত ;—
মেঘের আড়ালে কর মায়ারণ,—
বন্ধু, এ নহে ক্ষত্রোচিত !

নর-নারায়ণে অসম এ রণে,
এই সুরাসুর-রণস্থলে,
হায় ! মহাকাল আপনা বিকালো
ওই মহামায়া-চরণতলে !
প্রেমিক ভুলিয়া প্রেমের দুঃখ—
কাম-সুখ-মোহে লুটায় শির,
পায়ে দ'লে তার ছিন্নমস্তা
ছিন্নমুণ্ডে হেসে অধীর !
কালীর কটিতে দোলে কাটা ছেলে
চেলি প'রে মাতা পূজিছে পা !
শবের মুখেও ফুটে উঠে হাসি,
হাসে মহামায়া হা হা হা হা !

অমাবস্যার গহন নিশীথে
হয়েছে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা,
নরমুণ্ডের মালা সাজাইতে
গাঁথিতেছে নারী ফুলের মালা !
বামে অসি-ঘায় ভক্ত পলায়
দখিন হাতের অভয় ছায়ে,—
নরের এ মোহে হেসে মহামায়া
ঢ'লে পড়ে মহাকালের গায়ে।
চেয়ে দেখে নর দেউল খালি ;—
কোথায় দেবতা, কোথায় বা জয় ?
হাসিছে ললাটে হোমের কালি !

দুঃখ আমারে দিয়েছো বন্ধু,
সে নিঠুরতা তো ক্ষমেছি আগে ;
দুঃখের মোর হল অপমান ;—
রাবণের চিতা চিত্তে জাগে !

সর্ষে ফুল

বন্ধুর পরামর্শে
প্রাণের ভিটায় লাঙল চালায়ে ছিটায়ে দিলাম সর্ষে !
ভেবেছিনু মনে, শেষ ক'রে দিনু অতীতের যত স্মৃতি।
উঠিবে তুপ'রে, বড় জোর, হেথা ঘুঘুর চরম গীতি !
চাষের উপর আগামী বর্ষে নেমে বর্ষার জল,
ফসল হোক বা না হোক, ভিটাটি হয়ে যাবে সমতল।
তাই—বন্ধুর কথা শুনে,
অতীতের সাথে বাঁধন ঘুচাতে দিলাম সর্ষে বুনে !

কে জানিত ওরে, সর্ষে গাছেও ফুটিবে এমন ফুল—
বর্তমানের সাদা চোখেতেও ঘুরে অতীতের ভুল !

মদির গন্ধে মরা আনন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠে ;
আমারো বক্ষে মধু লুটিবারে লাখো মৌমাছি জুটে !
দুপ'র বেলার স্বপ্নসায়র চৌদিকে মোর দুলে,
রূপের খেয়াল, গন্ধের ঢেউ, ভাঙে হৃদয়ের কূলে ;
এ পোড়া ভিটের সুরকি ও ইঁটে কোথা এত রস ছিল ?
শীতের শুকনো বাতাসের বুকে বসন্ত এনে দিল !

সুধীরকুমার চৌধুরী

(১৮৯৭)

অসি দাও

আজি ভয়-বিহ্বল রাতে,
একখানি অসি দাও, হাতে ওর অসি দাও,
এক খানি অসি দাও হাতে !
হৃতবল পেশী তার, জানি,
তবু দাও অসি একখানি ;
নিবিড় তিমিরে হায়, আঁখিতারা ডুবে যায়,
আলো ম'রে যায় অপঘাতে,
বনপথে কোথা দিশা, দুর্যোগ-ঘন নিশা,
একখানি অসি দাও হাতে।
জীর্ণ আগল তার দ্বারে,
হিংসা ফুঁসিছে চারিধারে,
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা
মুখ গুঁজে আছে বিছানাতে,

বাহুতে যেটুক্ বল তাই তার সম্বল
আজি ভয়-বিহ্বল রাতে
একখানি অসি দাও, হাতে ওর অসি দাও,
একখানি অসি দাও হাতে।

গেছে যুগ-যুগান্ত কেটে,
জমি চষি' বুনি' তাঁত করে দিন অতিপাত
নীরবে দিবসরাত খেটে।
শুধাতে থাকেনি অবসর
কোন্ রাজা এল কার পর।
খুশি থাকে বারোমাস জুটিলে কৌপীনবাস
দুমুঠো পড়িলে ভাত পেটে।
তারও পরে যাহা রয়, জেনেছে সে তার নয়,
দিয়েছে দরাজ হাতে বেঁটে।
জীর্ণ আগল তার দ্বারে,
দস্যু ফিরিছে চারিধারে।
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা,
দেখে আর বুক যায় ফেটে।
আগুলিয়া ক্ষুদকণা, দিতে পারে সান্ত্বনা
একখানি অসি পেলে হাতে,
দুর্যোগ গেলে কাটি' আবার চষিবে মাটি,
কৌপীন বুনিবে ফিরে তাঁতে।

তোমরা যে রাজার স্বজাতি,
আজ তোমাদেরও ঘরে থেকে থেকে বাজ পড়ে,
বারে বারে নিবে যায় বাতি।
আজি ভয়বিহ্বল রাতে
বৃথা হাত রাখো তার হাতে,
ছাড়া পেলে হাত দুটি কেটে করে কুটিকুটি
নিবিড় তিমিরভরা রাতি।

যে আকাশে তুলে চোখ ভোলে ভয়, ভোলে শোক,
সেথা যে মৃত্যুর মাতামাতি !
আকাশে মরণ মেলে ডানা,
দেবতা কোথায় নাহি জানা।
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা,
একা সে তাদের আজি সাথী,
তারই পানে চোখ তুলে র'বে এরা ভয় ভুলে,
আজি দুর্যোগ-ঘন রাতে,
যদি হাতে অসি দাও, হাতে তার অসি দাও
একখানি অসি দাও হাতে !

আজি কে মৈত্রীর কথা কহে ?
কৌপীন, ক্ষুদকণা, তার বেশি চাহে তো না,
যেটুকু নহিলে তার নহে।
বেশি কিছু থাকে যদি তার,
সেথায় মৈত্রীর অধিকার।
সেইখানে যদি থাকো, হাতে তার হাত রাখো,
অসি তার কোষে ঢাকা রহে।
কারও ধনে নাহি সাধ, কারও সাথে নাহি বাদ,
সহে না যা তাও তার সহে।
আজিকে যে মরণের বাণে
নিরীহ জনেরে ওরা হানে।
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা,
কে আজি তাদের ভার বহে ?
বিরোধ বিরোধে ডাকে, নির্বিরোধীরে রাখে
কে এই মরণ-বরষাতে ?
হৃতবল তার পেশী, হয়ত চাহে না বেশি,
মরিতে সে চায় অসি হাতে ॥

জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪)

সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস,
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারান্‌টেলা—রহস্যের ; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস ; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে ; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে ? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি ?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি ? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি ;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান ?

জান পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব ; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি ছাখোনি তো—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ; যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিকের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে ;

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনোনাকো ; অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
জানোনাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

এই সব জানোনাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে ;
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে,
বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে-দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে।
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম আঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না ; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায় ॥

বাংলার মুখ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায় ॥

তোমার বুকের থেকে

তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চ'লে যাবে ; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে,
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়,—কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালী ধান

একদিন ;—হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে গা'বে তার গান,
আমেরে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার—তবুও তো চোখের উপরে
নীল মৃত্যু উজাগর—বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—

কখন মরণ আসে কেবা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো ;—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে ; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

ধান কাটা হ'য়ে গেছে

ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন—খেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এই সব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।

ওইখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হ'তো কতো কতো দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কতো অপরাধ ;
শাস্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ ॥

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে ;

পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে ॥

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান ।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে ?' সুধালো সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন ।'

সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা ;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি ॥

ভিখিরী

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত
তবুও তা স্নলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলে গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখিরীর ভুলে : এক পৃথিবীর ভুলচুক ॥

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে—সাঁই-সাঁই শব্দ শুনি তার ;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তা'রা।
তারপর প'ড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু-একটা কল্পনার হাঁস ;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জোৎস্নার ভিতর ॥

শব

যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে খুঁটে খায়
সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;
নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হ'য়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে-নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে ছাখো যদি ;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রুপালি নীরব ॥

ঘাস

কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেম্নি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে ।

আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে ॥

সুবিনয় মুস্তফী

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে
এক সাথে বেরাল ও বেরালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।
ইঁদুরকে খেতে-খেতে শাদা বেরালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হ'তে-হ'তে সেই ভারিক্কে ইঁদুর :
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তা'রা দুইজনে কতোখানি দূর
ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচকা মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছুদিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা ক'রে দিতে যেত—মাটির দরের মতো রেটে ;
তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেত ব'লে বেরালের পেটে
ইঁদুর 'হুররে' ব'লে হেসে খুন হ'তো সেই খিল কেটে কেটে ॥

ঘোড়া

আমরা যাইনি ম'রে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।

আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ওপাশের পাইস্ রেস্তরাঁতে ;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে ॥

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি ;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।

স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে ছাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে ;
ওরা সব ওই পথে—তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই—তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি ;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী ॥

নজরুল ইসলাম

(১৮৯৯)

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-
বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত
জয়শ্রীর !
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির ।

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !
আমি মানিনাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন !

আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড়
অকাল-বৈশাখীর !
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত
বিশ্ব-বিধাত্রীর !
বল বীর—
চির উন্নত মম শির !

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ !
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্ !
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা !
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায়্ হর্দম্
ভরপূর্ মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি !

আমি স্থষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান !
আমি ইন্দ্রাণী-স্থত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য !
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির !
আমি ব্যোমকেশ, ধরি' বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর,
বল বীর—
চির উন্নত মম শির।

আমি বেদূঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল,
ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড !
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব !
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস—আমি স্থষ্টি-বৈরী
মহাত্রাস,
আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস !
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী !
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির
মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল ঊর্মির হিন্দোল্-দোল্ !—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম
আমি ধন্যি।

আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ
আমি হুতাশীর!
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা
যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত
বুকে গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ
কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক'রে
দেখা-অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র
কাঁকন চুড়ির কনকন্
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর
কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস
পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে
সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্য-করতলে,

তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎহ্রেষা হেঁকে চলে !
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল !
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া,
দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চরি' ভূমি-কম্প ।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি' !
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল !

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী
আমি রুষে উঠে' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে
যায় কাঁপিয়া !
আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া ।

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী !
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য !
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ !!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব
সৃষ্টির মহানন্দে,
মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশ বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ
করিব ভিন্ন।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির ॥

সাম্যবাদী

(অংশ)

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা ব'লে, যাও বল আরো!
বন্ধু যা-খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সখ,—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি? পথে ফুটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে' দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।

বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে ব'সে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।

এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি'।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই॥

ভাঙার গান

(অংশ)

(১)

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্, কর্‌রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'!

(২)

গাজনের বাজ্‌না বাজা
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি,
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

'দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ'

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে ॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ মন অনন্তে বন্দে ॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে সে তারা চন্দে ॥
মালঞ্চে এ কী ফুল খেলা, আনন্দে ফোটে যুথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী সঙ্গে মাতি' কদম্বগন্ধে ॥

একান্তে তরুণী তমালী অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'লো দেয়া কেয়া-বেণীর বন্ধে ॥

দিনান্তে বসি কবি একা পড়িস কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে ॥

অমিয় চক্রবর্তী
(১৯০১)

উদয়ন

ঐ সোনা রোদের আঙুল
কোন্ নীল দূর থেকে ছোঁয় মোর চুল ;
রাঙা ভোর, গোলাপের ডালে
লাল হয়ে উঠেছে সকালে ;

মশারি সরিয়ে চেয়ে থাকি,
স্বর্গমুখী বাসনার আঁখি।

শান্তিনিকেতনে
স্ফটিক আকাশ রোজ প্রভাতী ছড়ায় দেহে মনে ;
সুগন্ধি বেলায়
নীলাম্বর দিকে দিকে খুলে যায় ;
শালবীথিকায় বৈতালিক
চলন্ত সুরের মন্ত্র ঘরে ঘরে দেয় প্রাথমিক,
রবীন্দ্রনাথের গানে আনন্দের ভাষা
তাই দিয়ে সুরু হয় সমস্ত দিনের যাওয়া আসা।

মনে হয় আলো-ভরা এই সুরে
শ্যামলী-পাড়ার হাওয়া স্নিগ্ধতায় আছে পূরে ;
সোনাঝুরি, হিমঝুরি, নীলমণিলতা
নাম যাঁর দেওয়া তাঁরি আলোয় ছুঁয়েছে দিব্যতা ;
কাঁকর পথের ছায়া মুগ্ধ রোদে পড়ে থাকে,
গোলকচাঁপার ডালে ভোরে পাখি ডাকে ॥

মানুষের ঈশ্বর

ঈশ্বর, মুখে দিয়ে দামী সিগারেট
বসে বসে দেখছেন স্বর্গে।
নতুন জুতো-পরা পা দুটো রেলিঙে
উঠিয়ে, আরাম ক'রে, ভালো খেয়ে দেয়ে,
মাটির পৃথিবীটাকে কৌতুকে করুণায়
ঈশ্বর দেখছেন স্বর্গ থেকে।

রং তাঁর মাঝামাঝি, চকচকে চুল,
মুখের ভাবটি বেশ, পোষাক নতুন—
নিগ্রো নাটকে তাঁকে দেখে থিয়েটরে
ধক্‌ ক'রে বুক ভ'রে ভালোবাসলেম।
মানুষের ঈশ্বর, মানুষের ঈশ্বর।

বঞ্চিত ক্ষুধা-চোখে; অপমান জীবনের
কাফ্রির ধ্যানে আজ আমিও প্রবাসী
জানলেম ভগবান, আমাদের ভগবান।
আহা তিনি অন্তত ভালো টুপি জামা প'রে
সুস্থ সুঠাম দেহে সৃষ্টি করুন—
আমাদের অভাবের দায় শুধু আমাদের
পৃথিবীতে সব আছে, তিনি তো দিলেন।
চন্দ্রসূর্যমাটি সব নিয়ে খাটুনিতে
তিনি যেন আমাদের ইচ্ছায় পান ধন:
বেশি শীতে কম্বল, গদি-দেওয়া ভালো খাট,
খোলা জানালায় ফুল, ধুলোহীন হাওয়া।
কত কাজ তাঁর ভাবি, আমাদেরই কাজ তাঁর—
মানুষের ঈশ্বর, মানুষের ঈশ্বর।

যখন বিশেষ কাজে নিগ্রো নাটকে তিনি
নামলেন পৃথিবীতে, সে ছবি সহজ—
বিকেল আলোয় পথে হেঁটে যেতে যা দেখেন
শহরে ও গ্রামে তা-ই ঈশ্বর-দৃশ্য।
সেই চোখে সাধারণ ফ্রক-পরা মেয়েটির
স্বর্গীয় ভাব জাগে গরিবের রাস্তায়;
তাঁরই দেওয়া প্রাণমন, যৌবন, দেহ তার।
কিম্বা কাফ্রি শিশু, অথবা মোড়ল বুড়ো,
দোকানে মলিন বেশ কারা ওরা দাঁড়িয়ে—

পাঁউরুটি, আলু, আর বই, খাতা সবই চাই,
জানেন তা ঈশ্বর, মানুষের ঈশ্বর।

কারো বাইবেল যুগে, কারো বৈদিকে,
কখনো মধ্যযুগে, পৃথিবীর লোক
আমাদেরই এ পাড়ায় ভগবান এসেছেন
—বলেছে হঠাৎ কাকে বিশেষ আলোয়।
তাঁরাও মানুষ, ভুলভ্রান্তি তাঁদেরও ছিল,
সমাজ-বাঁধনে তবু মন্দ ভালোয় মিলে
স্বর্গভাবের ছাপ দিয়েছেন যেতে যেতে
আলাদা সৃষ্টি নয়, সৃষ্টিলোকেরই।
দুঃখে সুখে শোকে ক্ষুধায় অভাবে আজ
আরো বেশি কাছে জানি সবারই জীবনে তাঁকে,
বাঁচবার অধিকারে প্রাণে প্রাণে এই তিনি
মানুষের ঈশ্বর, মানুষের ঈশ্বর॥ †

অন্নদাতা

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য—
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়—
সাধুতার সুদ কষে তবে হয় দাতা,
নয় তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগর:
তাদের দেওয়ায় ফলাবে না ধান শান-বাঁধা কলকাতা

† ন্যু-ইয়র্কে নিগ্রো নাটক দেখে।

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।
গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাখ হ'য়ে মাঠে নদী ধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবে না অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা ॥

বৃষ্টি

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী ;
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝরঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত টিপ,
নিভে যায় চোখে
কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।

বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝংকার
অবিরহ,
সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা।
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি, গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে—
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে॥

মাটি

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি।
বসে যদি থাকো তবু আগাছায় ধরে বিন্দু ফুল
হলদে-নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল—
ভুল থেকে সরে সরে অন্য কোনো নিয়মের চলা,
কিছু না-কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এই মতো।

তাইতে আরোই বেশি ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবি।

কচি বৃন্তে গুচ্ছ অন্নধান
সোনা মাঠে ছেয়ে দেবে শ্রমের সম্মান।
তারি জন্যে সূর্য তাপী, বাহুর শক্তির অধিকার,
মানুষের জন্ম নিয়ে প্রাণের সংকল্প বাঁচাবার।
বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে
আবার আকাশ ভরে রোদে।
তারি জন্যে শিশু আঙিনায়
দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়।

গাছ চাই, গাছ হবে, ছায়া দেবে, বাড়িতে বাগানে
শহরে শিল্পের সৌধে প্রাণ জাগে প্রাণে।
যা হয় তারই সে হওয়া আরোই উজ্জ্বল ক'রে তুলি
কঠিন লাবণ্যে ছুঁই মনের অঙ্গুলি।
বীজ আনি, জল আনি, ভাগ্যজয়ী খেলা তারো বেশি—
যে-রহস্য সর্বাতীত তারি সঙ্গে হোক রেশারেশি
অচিন্ত্য বিস্ময় খুলে যাই—
কিছু হয়, হয় না বা, এরি মাটি চষি এসো ভাই॥

বিনিময়

তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—
ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরল হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে।

তার বদলে পেলে—
শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর
খোলা রাস্তা ধুলো পায়ের,
কান্না-হারা হাওয়া—
চেনাকণ্ঠে ডাকল দূরে
সব হারানো এই দুপুরে
ফিরে কেউ-না-চাওয়া।
এও কি রেখে গেলে॥

মূল্য বদল

"খুলে পড়বে কানের সোনা শুনে বাঁশির সুর"।
মিথ্যের ধন হারালি প্রাণ, ছুঁলো যেই মধুর
নতুন কালের ভাঙন-লাগা ভরন্ত রোদ্দুর।

প্রাচীন গানের চাহন কাঁদায়, রই চেয়ে যদ্দূর।

আলাল ঘরের দুলাল যত গঙ্গাধারের কুঠি,
উনোন-ধারের বুক-ফাটা বুক, শাড়ি কুটোকুটি,—
দীর্ণ যুগের প্রাণ ভ'রে তাও পদ্ম ছিলো ফুটি'।

এক গোঙানির চাকায় বাঁধা গোরুর গাড়ি উঠি,
গেলো কোথায় যাত্রী কা'রা শুনে বাঁশির সুর॥

২

নতুন কাল কি সোনার বেশি, কালের ঝাঁঝর রোদে
রাই-পরানী হারা সোনায় আজো কি চোখ মোদে—
সামনে পথের কানাই যতই পেছনে দ্বার রোধে।

দুই মিলিয়ে প্রাচীন অচিন নাও নবযুগ বোধে।

পাঁজরা-ওঠা বাংলা গেলো ধ'সে জলের ধার
উড়ো গল্প—বাজার হাজার ভাসলো গাঙের পার।

ধন্য বিধি, জমিদার ও শ্মশান হাড়ের সার।

জ্বলন দিয়ে পুড়লো কিছু জ্বলবে আলোর সুর॥

৩

বাঞ্ছারাম আর বেণীবাবু; মোতিরাম, তার বাবা,
বৈদ্যবাটির চিনে জোঁকটি, ঠক চাচা, আর হাবা
সাঙ্গোপাঙ্গো আজো বেড়ায়; ব্লাকিয়র দেয় থাবা

তাদের কিন্তু জোর বংশধর, ভালো সেটাও ভাবা

গঙ্গাধারের হায় মোক্ষদা, প্রমদা, মা ঠাকৃরুন
যদিও টেকচাঁদ পারেননি প্রাণ দিতে তাও ধরুন,
দগ্ধানো দিন-পালা তাদের একালেও নিষ্করুণ।

বইলো কোথায় তাদের বুকে নতুন কালের সুর?

৪

ফিরি প্রাচীন সোনার ছাইয়ে: বাবুরাম সেই বাবু
বাগবাগিচা তালুক মুলুক লোভের ভারে কাবু

কস্তাপেড়ে ধুতি, উদর ঠিক গণেশের মতো
নাকে তিলক, ফুল-পুকুরে জুতো পায়ে যত,
কোঁচানো সেই চাদর কাঁধে—এক গালে পান কত।

কোথা কব্‌রেজ, বউবাজারের বেচারাম, আর জোড়া
হলধর ও গঙ্গাধর দুই "মণির টুক্‌রো ছোঁড়া"

পাপের তালে হাল্কা চালে বাঁধলো বিষের তোড়া।

কালের মজা কানের সোনা খসলো তাও রোদ্দুরে
ঠাসা হাসির ছবি, আলাল ; মুন্সী, ঠাকুর, উড়ে,
লুভী পুরুত, ঘিয়ের ধোঁয়া, হুঁকোর টানে ঘুরে
নীলকর আর মনিব সাহিব রোক্‌ সে শূন্য জুড়ে।

দেওনাগাজির ঘাটে যাবার পাল্কি গেলো দূর।

"শ্যামের নাগাল পেলাম না সই, মর্মে ম'রে রই"
কুঠিওয়ালার মার-খাওয়া লোক গাইয়ে এবং সই
ধন্য তা'রা ধর্মে কেনে চুট্‌কি গানের খই।

শ্যামের নাগাল পেলো কি ঐ অন্য চমৎকার
কলা-খাওয়া প্রেমনারায়ণ (পদ্‌বী মজুমদার)

আলাল কিন্তু তার উপরে আরোই অনুদার :
"করি হেন (ঠিক) অনুমান তুমি (ই) হনুমান"
ছড়া কাটার কি ছল বলো এমনতরো গান—

শেষ কলি তার ভাঙা বাংলার হয়তো ভালো ভাও
"সমুদ্দুরের তীরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে লাফাও,"
সমাজপ্রীতি আলাল-নীতির সোনার বচন চাও ?

"শৃগালদিগের হোয়া হোয়া," ঝিঁঝি পোকার ঝিঁঝি
"শাঁখের ঘণ্টা খনর খনর" শব্দে হিজিবিজি
ডুবলো সে-সব কালের জলে চোখের জলে ভিজি।

শেয়াল ঝিঁঝি অবশ্য নয় রূপক শুধু রাতে—
প্রতীক গেলো, আসল তা'রা খুবই আছে সাথে,

রইলো সঙ্গে খাঁটি বাংলার প্রাচীন আলোর সুর।

সাবেকি কলকাতার পাড়া, নকল কায়দা মানা
হুজুর হাজুর ত্রস্ত, সেলাম হুঁকো দস্তুর জানা
বেঁচেছি সেই সোনার দিন সব ভাগ্যে পেলো হানা,

নবাবী ইংরেজের পালা ছিন্ন পাখির ডানা।

কাদায়-কাঁদায় ইতর-বড়ো জাতি-পাঁতির বঙ্গ
থাকুক তা টেক-চাঁদের কাব্যে ; সে-ব্যঙ্গে দাও ভঙ্গ

খরখরে রোদ বুকে বাজুক জাগর দিনের রঙ্গ।

বাংলা আলো নতুন দিনের ধরো স্বাধীন মেয়ে
গয়না খসুক জড় দিনের, যে-দিন গেছে ধেয়ে ;
বলো যুগের নতুন যুবা গর্বে সমুখ চেয়ে

"খুলে পড়লো কানের সোনা শুনে বাঁশির সুর॥"

সার্কাস

রং মাখা সং আমি রঙিন দড়িতে
ঝুলে পড়ি, এলোমেলো দশ গজ ফিতে
দুই কানে বার করি, লাল নীল গাল
গাধা টুপি সাদা নাকে ঠেকেছে কপাল।

বত্রিশ বছর নখে শূন্য আঁচড়িয়ে
হেঁটেছি চৌতলা উঁচু সরু তার দিয়ে,
শুনি ঝোড়ো তালি,
"সার্কাস সাবাস্ ক্লাউন্, শখের বাঙালি"—
উপরে ট্রাপিজে দুই রুপোলি মেয়েরা
ঝাঁপায় বিজুলি লাফে, স্বপ্নে চোখ-চেরা—
সবাই, ক্ষুদে কি বড়ো, পরীরাজ্যে ডোবা
ঝাপ্সা চোখে দেখে ঘোড়-সোয়ারির শোভা :
চার চার রাজপুত্র থিয়েটরি সাজে
মখমল পাগড়িতে হীরে, সস্তা ব্যাণ্ড্ বাজে।
কেন হেন ব্যাবসা বাঁধি, উদ্দেশ্য, প্রমাণ
প্রকাণ্ড ভালুক, বাঘ, দুটো হনুমান।
হল্‌দে পাখি চাও ?
নতুনের চোখে দেখবে হঠাৎ উধাও।
মস্ত হাতি হালকা নাচে উল্টে ধরে আলা
পোষমানা শুঁড়ে তোলে পিরিচ পেয়ালা—
মাহুত চেয়ারে হাসে, সপাং সপাং
চাবুক আওয়াজ মিথ্যে, বিনা জাদু ভাং
আসল সার্কাস ;
কোথাও পালানো নয়, ভিড়ে-চড়া বাস্
একেবারে সামনে আনে : এ কাজে অবশ্য
পপভ্, চ্যাপ্‌লিন, ডিস্‌নি সবার নমস্য—
ঝলমল প্রাণ থেকে ছলছল বুকে
আশ্চর্যের নানা ভঙ্গি কত কী কৌতুকে ;
তুমি আমি আসবো যাবো, তাঁবুর নিশান
উড়বে আজ আসানসোলে, কাল বর্ধমান॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
(১৯০১-১৯৬০)

অহৈতুকী

কিছুই হয়নি আজ। সে কেবল ছিল নিরুদ্বেগ
মোর ক্ষিপ্র পরশের চমৎকৃত নম্র নিবেদনে ;
অন্তর্গূঢ় আহ্বানের বৈদ্যুতিক রহস্যলিখনে
উঠেনি উদ্ভাসি তার নয়নের নির্বচন মেঘ ;
আসন থাকিতে পাশে সে-দিকে সে তাকায়ে দেখেনি ;
গাঢ় সদালাপে তার অবকাশ আসেনি বারেক ;
সংবৃত বক্ষের তলে নিঃশ্বাসের রুদ্র অতিরেক
পদকে পড়েনি ধরা, তার কাছে দুঃসহ ঠেকেনি।

কিছুই হয়নি আজ। তবু জাগে কী শোক মরমে :
অনাথ সাধ্বীর মতো ধরা যেন ধায় অধঃপাতে ;
নিহত সুন্দর শিব অনুচর পিশাচের হাতে ;
অরাজক চরাচরে উচ্ছৃঙ্খল বিভীষিকা ভ্রমে।

মনে হয়ে একা আমি।—পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে
পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে॥

উটপাখি

আমার কথা কি শুনতে পাওনা তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।

নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পলাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও ;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদ্‌প্রাজ্ঞ নও।
নবসংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনও নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা ;
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি,
শ্রমণশোভন বীজন বানাবো তাতে ;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে ;

সে-পাড়া-জুড়নো বুল্‌বুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উন্‌তিরিশে।

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু জনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥

জাতিস্মর

নাথু-সংকটে হাঁকে তিব্বতী হাওয়া।
প্রাকৃত তিমিরে মগ্ন চুমলহরি।
ছঙ্গু-সায়রে কার বহিত্র বাওয়া
অপর্ণ বনে দিয়েছে রহস ভরি।

সুহৃদ আগুন নিবে গেছে গৃহকোণে ;
শ্রান্ত সাথীরা স্বপনে আপনহারা ;
আমি শুধু ব'সে তুষারিত বাতায়নে
প্রহরে প্রহরে গুণি খসে কত তারা।

অঙ্গ তুহিন, তপ্ত আমার মাথা,
ক্লান্ত, তথাপি নিদ্রা আসে না ডাকে ;

বাণীহীন কোন্ অনাদি বিষাদগাথা
গুঞ্জরে বিস্মরণের ফাঁকে ফাঁকে।

হিমানীবিজন এই দুর্গম দেশে,
মনে হয় যেন, কে আমার অনুগামী ;
হয়তো বা আমি ভুলে গেছি আজ কে সে,
কিন্তু ভোলেনি তারে অন্তর্যামী।

বিগত জনমে, এই পর্বতশিরে,
এমনই নীরব প্রাগিতিহাসিক রাতে
শিকার সমাপি এসেছিনু ঘরে ফিরে
মৃগের বদলে তাহারে কি ল'য়ে সাথে ?

মিনতি আমার প্রথমে ধরেনি কানে ;
কুটিল ভ্রূকুটি মোছেনি ললাটে ত্বরা ;
তার পরে কেন—তা কেবল সেই জানে—
অযাচিতে হল সহসা স্বয়ংবরা।

চ্যুত বল্কলে নিবে গেলো দীপখানি ;
বাহিরের হিম মুকুরিল দ্রব চোখে ;
হঠাৎ তাহার লঘু, ভাস্বর পাণি
খুঁজিল আম'রে প্রাক্তন নিরালোকে।

আবার কি তার আদিম নিমন্ত্রণী
আহ্বানে মোরে অমৃতের অভিসারে ?
কাঁদে সেদিনের প্রণব প্রতিধ্বনি
প্রতন গিরির গহ্বরকারাগারে ?

পুরাণপুরুষ ছাড়া পাবে নিমেষে কি ?
মাটির মানুষ মিলিবে মাটির সনে ?

বিদগ্ধ প্রাণী, এ কি মরীচিকা দেখি ?
ফিরিব প্রভাতে পরিচিত পরিজনে।

মৌল আকৃতি মরমেই যাবে ম'রে।
জনশূন্যতা সদা মোরে ঘিরে রবে।
সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে
চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।

বর্বর বায়ু চিরায়ু অচল চূড়ে
মুছে দিবে মোর অশুচি পায়ের রেখা।
মার্জিতরুচি জনপদে, বহু দূরে,
ভিড়ে মিশে আমি ভেসে যাব একা একা

প্রার্থনা

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কমঠবৃত্তির অহংকারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারংবার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে
রৌদ্র জ্যোতি হ'তে

আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ।

পিতৃ-পিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হ'য়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে।
বাচাল বিদ্রূপে
হুঙ্কারিলে দুর্বৃত্তের উদ্ধত দম্ভোলি
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্চল পায়ে ; আর্তির সংক্রাম
কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে,
হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্মীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবই তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়।

এলে পরে লাভের সময়
সদসৎ-নির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর, নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে
তোমার প্রতিভূ সেজে উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।

ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাসরি,
দারুণ দুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই ?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
শকুনির ক্ষুধানিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে
সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও
আমার রথাশ্বরজ্জু, হে সারথি, তুলে নাও হাতে।
স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক বিচার হানো। মর্মে মর্মে, মজ্জায় মজ্জায়
জাগাও অন্যায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়
পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও দাও মোরে।
অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবীবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে।

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে ;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্ভাবে

হয়নি বাসোপযোগী অদ্যাবধি যে-নিস্তাপ মরু ;
পশুপতি বাজায়ে ডমরু
মোর গোষ্ঠীপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায় ;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান ॥

প্রতীক্ষা

পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি ?
জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী :
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে ?
বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধূ ধূ করে ;
নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে ;
যা ছিল বলার, কবে হয়ে গেছে বলা সে ।

মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত,
বিবিক্তি আজ বেষ্টনীবিরহিত ;
অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী ;
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা,
সোহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই ।

আরও এক বার, হাজার বছর আগে,
বিপ্রলব্ধ আস্থা অস্তরাগে
খুঁজে পেয়েছিল উজ্জীবনের প্রেষণা ;

এবং আবার সহস্র বৎসর
পূরে আসে বটে, তবু মন্বন্তর
মানবেতিহাসে সর্বনাশেরই দেশনা।

অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর
অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার
অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ,
সময়ের স্রোতে অচির, অরুন্তুদ,
মমতার জোট পাকায় এ-চরে, ও-চরে।

অভাব হয়তো স্বভাবেরই অগ্রজ :
নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ—
প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে :
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু,
পৃথিবী অনাথ ; যথেচ্ছ পরমাণু ;
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে।

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই ;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে :
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি ?

অগ্রহায়ণ

হেমন্তের বেলা প'ড়ে আসে :
ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা হয়ে গেছে সারা,
খামারে খামারে সোনা, ভারা ভারা খড় আশেপাশে ;

স্তব্ধ ঘাট, রিক্ত বাট ; একমাত্র তারা
অনুমিত পাণ্ডুর আকাশে।

রহস্যের অনচ্ছ অভিধা
মুকুরিত সরোবরে ; হৃতবাক্ ক্রমে
প্রবিষ্ট নিবিড় ছায়া, বহিরঙ্গে বিশীর্ণ মলিদা ;
অবলুপ্ত জনপদ ইন্দ্রনীল ধূমে,
ঘরে ঘরে প্রদোষের দ্বিধা।

শোধবোধ শূন্যে অবসিত :
নির্গত স্বেদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত ক্ষমতা ;
পারিশ্রমিকের ক্লান্তি সর্বস্বান্ত শরীরে কষিত ;
নষ্ট নীড়ে বিবিক্ত সে, স্বগত মমতা,
অবকাশে নির্বেদ শ্বসিত।

ঘুম নেই তবু রুদ্ধ চোখে :
শিথিল সন্ধিতে জাড্য, ধমনীতে হিম ;
কিন্তু সে, এখনও অন্ধ অস্তমিত সূর্যের আলোকে,
বোঝে না স্বভাবদোষে রাত্রির কুট্টিম
বররুচি অক্ষয় অশোকে॥

তীর্থপরিক্রমা

এখনও গেল না ভোলা, যদিও এ-দেশ স্নিগ্ধ নয়
সুবর্ণধারায় : ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত মাটি, তবু ক্ষয়
এবং পিপাসা এখানে সর্বতোব্যাপী ; অস্থিসার
গিরি কদাচিৎ তুষারকিরীটী বটে, কিন্তু তার
সান্নিধ্যে প্রশান্তি নেই—যেন অতিজীবিত ক্ষত্রিয়,
বাহুবল গত জেনে, তপোবল সাধে, অস্বকীয়

প্রতিহিংসা শেষে যাতে অসিদ্ধ না থাকে ; শুধু শিলা,
বালু শোষিত নদীর গর্ভে বন্যার প্রত্যাশী ; নীলা
দিনে, হীরক নিশীথে—আভরণে এই যা প্রকারভেদ,
বর্বর আকাশ নচেৎ নিয়ত নগ্ন, অনির্বেদ,
তথা নির্বিকার ; এবং নগরে, গ্রামে, বাহিরে ও
ঘরে আরবেরই উত্তরাধিকার যেহেতু অজেয়,
তাই উহ্য অবিশ্বাসে উদ্বিগ্ন মানুষ, অহংকৃত
সৌজন্য সত্ত্বেও, মৎসর অদৃষ্টবাদে, ব্যবস্থিত
অথচ উদ্দাম অন্তত সংসক্ত নৃত্যে।
লোকান্তরে
বুঝি, সম্ভবত অপর কল্পেও, পুষ্পিত প্রান্তরে
পেতেছিলুম আমরা যে-অস্থায়ী যৌবরাজ্য, তার
অধিষ্ঠাতারূপে ছিল প্রজ্ঞাপারমিতা ; কি প্রাকার,
কি পরিখা সে-রাষ্ট্রকে ঘেরেনি কখনও : মুক্ত পথে
ছায়াচ্ছন্ন ক্ষিতিজের ডাক, ঊর্ধ্বশ্বাস মনোরথে
অধিরূঢ় নিরস্ত্র এষণা, সহচর স্রোতস্বিনী
অভয়ে মুখর, আগন্তুক অপ্রবাসী, ও অঋণী
নিঃস্বও যেখানে, তার পরে দুর্বিষহ এ-মরুর
অস্থ অবসাদ। কিন্তু চক্রচর কাল : সুরাসুর
বিশ্বে সমবল, সম্পূর্ণ পৃথিবী ঊষর, উর্বর
একাধারে, ধর্মে, কর্মে, শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর—
তা আমার সমবয়সীরা মানেনি, মানিনি আমি ;
ফলে আমাদের নিয়তি অগস্ত্যযাত্রা, অনুগামী
হত বা বিস্মৃত ফণিমনসার বনে। তবু বলি—
এখনও গেল না ভোলা : তীর্থরজে রক্তের অঞ্জলি ॥

নষ্টনীড়

কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে,
কুলায় খোঁজে শুক :
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ ।
কেবলই দূর মুখর তবু পবনে,
কোথায় যেন নিবিদ বলে স্বনে ;
চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে
কালের কৌতুক ।
বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধীরে ঝাড়ে :
কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক ।

কখন ওঠে, পাতালভেদ ক'রে,
অসম্ভূত অমা :
বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে ;
দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা ।
জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসও,
তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশ ;
মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,
স্বয়ংবর প্রমা ।
তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে,
মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা ?

প্রমথনাথ বিশী

(১৯০২)

বসন্তসেনা

একদিন গৃহপাশে ক্ষণকাল তরে
হয়েছিলে কেনা
আজিও সে স্মৃতি জাগে বিশ্বের অন্তরে,
হে বসন্তসেনা !

সে দিনের মালিকার ঝ'রে গেছে ফুল
চাঁপা, যূথী, হেনা
নূতন বাঁধন লাগি, অন্তর আকুল,
হে বসন্তসেনা !

ক্ষণ ইন্দ্রধনুসম যে চুম্বনখানি
থরে, থরে, থরে
উঠেছিল বিকশিয়া হে গর্বিতা রানী
তোমার অধরে—

চিরযৌবনের নভে আজো জাগে সেই
আকাশ-কুসুম,
তাহারে রাঙায়ে দিতে আনিয়াছি এই
স্বপ্নের কুঙ্কুম।

জ্যোৎস্নালুপ্ত বসতির শ্লথ শয্যা 'পরে
অর্ধজ্ঞানগতা,
প্রমোদ-অধীর দুটি ভঙ্গুর অধরে
কত বৃথা কথা !

ক্ষিপ্তবক্ষ আন্দোলনে আর্ত আকুলতা
আস্তন-বন্ধুর
তোমার বক্ষের পরে—কোথায় গেল তা
—গেল কোন্ দূর ?

শিয়রে কনক পাত্রে বুদ্বুদ-উজ্জ্বল
মত্ত ফেনিলতা ;
পরুষ বল্লভ করে প্রায় শ্লথ হল
তব বেণীলতা।

ইন্দ্রিয়ের বাধা টুটি মর্মে প্রবেশের
সেই যে সন্ধান,
সীমার দিগন্ত ভাঙি অচক্ষু দেশের
এই যে সন্ধান,

কোথা বলো শেষ তার, কোথা অন্ত হায়,
কোথা সমাধান ?
দেহের অর্গল ভাঙি দস্যুদল প্রায়
প্রাণ চাহে প্রাণ !

কে দেখেছ ভেদ করি মাংসের জঞ্জাল
রহস্য আত্মার,
মুক্ত সে যে অকলঙ্ক শানিত বিশাল
নগ্ন তরবার।

কার সুললিত ওই স্বর্ণ কোষখান
জানি মধুময়,
কেহ না লভিল হায়, এই যে কৃপাণ
তার পরিচয় !

দেহের খিলান তলে ব্যগ্র দুই চোখে
চলি হাতড়িয়া
জানি একদিন চক্ষু হঠাৎ আলোকে
যাবে ঝলসিয়া।

আত্মার বিদ্যুৎ-দীপ্ত সে রহস্যখান
আজিও অচেনা
আছে আশা একদিন পাইব সন্ধান,
হে বসন্তসেনা॥

মণীশ ঘটক

(১৯০২)

কুড়ানি

১

স্ফীত নাসারন্ধ্র, দু'টি ঠোঁট ফোলে রোষে,
নয়নে আগুন ঝলে। তর্জিলা আক্রোশে
অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া,
'খাট্টাইশ, বান্দর, তরে করুম না বিয়া'।

এর থেকে মর্মান্তিক গুরুদণ্ড ভার
সেদিন অতীত ছিল ধ্যান ধারণার।
কুড়ানি তাহার নাম, দু'চোখ ডাগর,
এলোকেশ মুঠে ধরি' দিলাম থাপড়।

রহিল উদ্যত অশ্রু স্থির অচঞ্চল,
পড়িল না এক ফোঁটা, বাজাইয়া মল
যায় চলি'—স্বগত সক্ষোভে কহিলাম
'যা গিয়া—একাই খামু জাম, সত্রিআম !'

গলিতাশ্রু, হাস্যমুখী, কহে হাত ধরি'
'তরে বুঝি কই নাই ? আমিও বান্দরী ।'

২

পঞ্চদশী গৌরী আজ, দিঠিতে তাহার
নেমেছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার ।
অনভ্যস্ত সমুদ্ধত লাবণি প্রকাশে
বিপর্যস্তদেহা তন্বী । নিম্ন ওষ্ঠপাশে
রহস্যে কৌতুকে মেশা হাসির আবির
সুদূর করেছে তারে, করেছে নিবিড় ।

সান্নিধ্য সুদুর্লভ । তবুও সদাই
এ ছুতা ও ছুতা ধরি' বিক্ষোভ মেটাই ।
গাছের ডালেতে মাখি' কাঁঠালের আঠা
কখনোসখনো ধরি শালিক, টিয়াটা,
কুড়ানিরে দিলে করে সিধা প্রত্যাখ্যান
'আমি কি অহনো আছি কচি পোলাপান !'

অভিমানে ভরে বুক । পারি না কসাতে
সেদিনের মতো চড়, অথবা শাসাতে ।

৩

ছুটিতে ফিরিলে দেশে, কুড়ানি-জননী
আশীর্বাদ বরষিয়া ক'ন 'শোন মণি,
কুরানি উন্নিশে পরে, আর রাহি কত,
হইয়া উঠ্ছে মাইয়া পাহার পর্বত ।'

'সুপাত্র দেহুম' কহি' দিলাম আশ্বাস,
চোরা চোখে মিলিল না দরশ আভাস।

ম্লান মুখ, হতবাক, ফিরি ভাঙা বুকে—
হঠাৎ শুনিনু হাসি। তীক্ষ্ণ সকৌতুকে
কে কহিছে 'মা তোমার বুদ্ধি ত জবর!
নিজের বৌয়ের লাইগা কে বিস্‌রায় বর?'

সহসা থামিয়া গেল সৌর আবর্তন,
সহসা সহস্র পক্ষী তুলিল গুঞ্জন,
সহসা উতলা হাওয়া শাখা দুলাইয়া
সব ক'টি চাঁপা ফুল দিল ফুটাইয়া॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
(১৯০৩)

রবীন্দ্রনাথ

আমি তো ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে :
চলোরে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে
চমকি উঠিনু জাগি,
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন অভিসারে দূর-পানে ধাও,

আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।
দেখি চন্দ্র-সূর্য-তারা
মত্ত নৃত্যে দিশাহারা
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি।
আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিণী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জলে
কুল হ'তে নিলো মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।
তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে ;
তুমি ছাড়া আর কার
এ উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে

দূরের মেয়ে

তোমারে চিনি না, তাই বুঝি আজ
এতোই দূর :
জানো না কি তুমি সেই পরিচয়
কতো মধুর।
চোখ দু'টি তব ঠাণ্ডা, নীরব,
গা থেকে গড়ায় রূপালি গরব,

নিজের কঠিন দেহের আড়ালে
আছো আপনি :
দেয়ালে কখনো ফুটবে না যেন
প্রতিধ্বনি।

কিন্তু কে জানে মিললে আমার
চোখের কণা,
ঘ'টে যেতে পারে তোমার জীবনে
দুর্ঘটনা।
এ উদাস মেঘ চ'লে যেতে পারে,
তনুর তুষার গ'লে যেতে পারে,
চোখের দু'পাতা স্বপনের ভারে
আসবে নেমে,
এক নিমেষেই প'ড়ে যেতে পারো
আমার প্রেমে।

আসবে কখন সোনার সময়
আছে কি ঠিক ?
জাগবে তারকা দেহের আঁধারে
আকস্মিক।
ঝিরঝির ক'রে গায়ে দেবে হাওয়া,
উঠবে রসিয়ে নয়নের চাওয়া,
ধারালো তনুর রেখায় ঝরবে
লীলা পিছল,
আঙুলের মুখে মুখর হৃদয়
কথা-চপল।

আকাশের নিচে কখন কী হয়
যায় না বলা,
হয়তো শুনবো আমারি দুয়ারে
তোমার গলা।

হয়তো চমকে দেখবো হঠাৎ,
আমার ছু'কাঁধে রেখেছো ছু'হাত ;
'হ'তেই পারে না'—বলতে কি পারো ?
বলা কি যায় ?
সময় যখন ডাক দিয়ে যাবে
তা'র পাখায় !

সেই যদি তুমি একদিন মোর
আসবে কাছে,
মিছিমিছি তবে দেরি ক'রে বলো
লাভ কি আছে ?
জানো তো মোদের নেই বেশি ক্ষণ,
আসবেই যদি, এসো-না এখন,
বিকেলের আলো ফিকে হ'য়ে আসে,
ঘন, ঘোলাটে,
তুমি না আসলে কী ক'রে বলো এ
সময় কাটে ?

বলো তো না-হয় আলোর শিখাটি
দেবো কমিয়ে,
নেহাৎ চাও তো, দূরেই না-হয়
বসবে, প্রিয়ে !
না-হয় কিছু-না বললে কথায়,
শুনবো তনুর উদ্বেলতায় ;
শাড়িতে জড়ানো শরীর-লতায়
জ্বলবে বাতি,
থাকুক না-হয় আমাদের ঘিরে
অচেনা রাতি।

পারতো যা হ'তে, কী হয় তা হ'লে ?
হ'লোই বা না,

মুহূর্ত ফের উড়ে চ'লে যাবে
মেলিয়া ডানা।
চুল বাঁধো নাই, কী-বা এসে গেলো,
গায়ে গায়ে থাক শাড়ি এলোমেলো,
পা দু'টি আজকে নাই-বা রাঙালে
আল্‌তা-রাগে,
আসবেই যদি, এলেই না-হয়
দু'দিন আগে ॥

সৈন্য ও সন্ন্যাসী

এসেছে সংস্কৃত সূর্য প্রদ্যুতিত মার্জিত আকাশ :
মাঠে আর আল নাই, মুছে গেছে স্তরপঙ্‌ক্তিভেদ,
শোণিতে প্রস্বেদে ক্লেদে লিখিলাম যেই ইতিহাস
ধরিত্রীর ভাগ্যে তাহা অমৃত-নিস্যন্দ-আয়ুর্বেদ।

পিধানে নিরুদ্ধ অসি, পরিবর্তে ভূতলে লাঙল—
নিঃসহ সংগ্রামশেষে শ্লথতনু পেয়েছি বিশ্রাম,
ফলেছে পর্যাপ্ত শস্য বলস্ফূর্ত শ্যামল স্নেহল
ধরণীরে মনে হয় স্বপ্নময় সুখস্বর্গধাম।

মিটেছে খাদ্যের ক্ষুধা, নির্বাপিত বস্তুর জিগীষা,
ক্লেশহীন সর্বপ্রাপ্তি, দেশহীন ব্যাপ্ত অবিদ্বেষ—
তবু সেই দীপ্ত চন্দ্র, আকাশ-আকীর্ণ শতভিষা,
তবু সেই দিগন্তের ক্ষীণ প্রান্তে অনন্ত নির্দেশ।

তবুও অপ্রাপ্যা তুমি, কি আশ্চর্য, তবুও অধরা,
তবুও তেমনি দূরে, মূলে স্থূলে দাঁড়াবে না আসি ;
তবুও তোমার লাগি দুই আঁখি যামিনীজাগরা—
সৈন্য আমি, যুদ্ধজয়ে পুনর্বার হয়েছি সন্ন্যাসী ॥

জসীমউদ্দীন

(১৯০৩)

রাখালী

(অংশ)

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রান্‌তে ব'সে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
সান্ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে,
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোন মতেই থামতে নারে।
এই মেয়েটি এম্‌নি ছিল যাহার সাথেই হ'ত দেখা
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা।
মা বলিত, বড্ডরে তুই মিছিমিছি হাসিস বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়!
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার, না সে আবির,
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধো আলো রঙিন রবির।
কেমন যেন গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে-ফোটা কল্‌মি ফুলে কতটা তার খেলে বাহার।
গালটি তাহার এমন পাতল ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে,
দু-একটি চুল এলিয়ে প'ড়ে মাথার সাথে রাখছে ধ'রে।
সাঁঝ-সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফিরুত যখন হেসে খেলে,
মনে হ'ত ঢেউয়ের জলে ফুল্‌টিরে কে গেছে ফেলে!

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চল্‌ত ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসিটিরে।
দোষ কি তাহার? ওই মেয়েটি মিছিমিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল! অমন রূপে কেম্‌নে রাখে পরানটা সে!

এ পথ দিয়ে চল্‌তে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে।
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভ'রে।
মাঠের ছেলের 'নাস্তা' নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
পথে ভুলে কি যায় সে ওগো ওই মেয়েটি রান্‌ছে যেথায়।
'নীড়ে'র ক্ষেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি'
ভর দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ি।
ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটির বাঁশীটিরে
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সেথায় কিসের কথা!
এমনি করে দিনে দিনে লোক-লোচনের আড়াল দিয়া
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া।
সাঝেঁর বেলা ওই মেয়েটি চলত যখন গাঙের ঘাটে
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগত ভারি ওদের বাটে।
মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস
ওই মেয়েটির জল-ভরনে ভাসত ঢেউয়ে রূপের উছাস।
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বলত যেন মনে মনে
"জল ভর লো সোনার মেয়ে, হবে আমার বিয়ের ক'নে?
কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশি বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা,
বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের
সোনালতায় গড়ব বালা তোমার দুখান সোনাহাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটিরখানি
মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেব সরষে ফুলের পাপড়ি আনি'।
কাজলতলার হাটে গিয়ে আনব কিনে পাটের শাড়ি,
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ি?"

হলুদ বাটিছে মেয়ে

হলুদ বাটিছে হলুদবরণী মেয়ে,
হলুদের পাটা হাসিয়া গড়ায় রাঙা অনুরাগে নেয়ে।
দুই হাতে ধরি' কঠিন পুতারে ঘষিছে পাটার 'পরে,
কাঁচের চুড়ি যে রিনিকিঝিনিকি নাচিছে খুশির ভরে,
দুইটি জঙ্ঘা দুই ধারে মেলা কাঠগড়া কামনার,
তাহার উপর উঠিতে নামিতে সোনার দেহটি তার ;
মর্দিত দুটি যুগল শারণী শাড়ি-সরসীর নীরে,
ডুবিতে ভাসিতে পুষ্প-ধনুরে স্মরিতেছে ঘুরে ফিরে।

হলুদ বাটিছে হলুদবরণী মেয়ে,
রঙিন উষার আব্সা হাসিতে আকাশ ফেলিল ছেয়ে।
মিহি-স্বরী-গান গুন্গুন্ ক'রে ঘুরিছে হাসিল্ ঠোঁটে ;
খুশির ভোমরী উড়িয়া মুখের পদ্মের দল লোটে।
বিগত রাতের রভস-সুখের মদিরা-জড়িত স্মৃতি,
সারাটি পাটার হলুদে জড়ায়ে গড়ায়ে রাঙিছে ক্ষিতি।
গাছের ডালে যে বুলবুলি বসি' ভরিয়া দু'খানা পাখ,
লিখিয়া লইতে তারি এতটুকু মেলিছে সুরেলা ডাক।

হলুদ বাটিছে হলুদবরণী মেয়ে,
হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনী গড়াইছে পাটা বেয়ে।
ডোল-ভরা ধান, কোল-ভরা শিশু, বুকভরা মিঠা গান,
কোকিল-ডাকান আম্রছায়ায় পাতার কুটিরখান।
চাঁদিনী রাতের জ্যোছনা আসিয়া গড়ায় বেড়ার ফাঁকে,
কৃষাণ কণ্ঠে বাঁশিটি বাজিয়া আকাশেতে প্রীতি আঁকে।
অর্ধেক রাত নক্সী কাঁথাটি মেলন করিয়া ধরি',
অতি সযতনে ফুললতা আঁকে মনের মমতা ভরি'।
ঘুম যেন আসি' গড়াইয়া পড়ে, সুরের লতালী ফাঁদে,
মাটির ধরায় টেনে নিয়ে আসে গগনবিহারী চাঁদে॥

অন্নদাশঙ্কর রায়

(১৯০৪)

আষাঢ়

আকাশে আষাঢ় ধেনু চরাইতে চলে
ধবলী শ্যামলী পাটলীরা দলে দলে
ককুদ দুলায়ে ধীর মন্থর গতি
যেতে যেতে ডাকে হাম্বা হাম্বা বলে।

আষাঢ়ের গোঠে কত যে বাছুর গাই
এক এক করে গুনিতেছি বসে তাই।
দিগন্ত হতে দিগন্ত সীমাবধি
গমনের স্রোতে আদি ও অন্ত নাই ॥

বর্ষামেঘ

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহারি সঙ্গে মেশা
রথ তুরঙ্গ ধাবন রভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুলকি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম-মার্গের দীপ্তি সে আসি' দিক বলে দেয় ধরায় ॥

হেমন্ত মেঘ

ছিন্ন কেশর কীর্ণ হ'য়ে ছেয়েছে নীল ধূলি
উদয় রবি ঊর্ধ্বে চলে ছুঁইয়ে চলে তুলি
চকিতে তারা পদ্ম-রাঙা চকিতে বকফুলী ॥

কবির প্রার্থনা

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ূখচ্ছটা, শতবর্ণ মেঘ,
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি, বনস্পতি পরমায়ু, মৃত্তিকার রস,
শিশিরের স্বচ্ছন্দতা, শিশুর শুচিতা, পশুদের নিরুদ্বেগ,
সর্বশেষে শর্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ ॥

গিন্নী বলেন

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিস্টি।
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার ? কমিউনিস্টি
পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি
তলে তলে কেটা ? কমিউনিস্টি।
কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি
নিয়ে এলো প্লেগ কমিউনিস্টি।
গেল সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি
ছেলেরা বনলো কমিউনিস্টি।
মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি
সেধে গুলি খায় কমিউনিস্টি।
যে দিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি
সে দিকেই দেখি কমিউনিস্টি।
তাই বসে বসে করছি লিষ্টি
এ পাড়ার কে কে কমিউনিস্টি ॥

মরা হাতি লাখ টাকা

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ধন্য রে তার হাতি
একবার হরি হরি বল্
হাতি যারা মারল তারা ফাঁপল রাতারাতি
যত লক্ষ্মীপেঁচার দল।
হাতির শোকে কাঁদল যারা চাপড়ে বুকের ছাতি
একবার হরি হরি বল্
চোখের জলের ছাপা বেচে কিনল জিনিসপাতি
যত সারস্বতের দল।
হাতির জন্যে হন্যে হয়ে করেন মাতামাতি
একবার হরি হরি বল্
নির্বাচনে কেল্লা জিতে ফুলে হবেন হাতি
যত গণপতির দল।
বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে মরা হাতির খ্যাতি
একবার হরি হরি বল্
অগৌরবের বড়াই করি আমরা হাতির জাতি
যত বেঁচে মরার দল॥

পণ

করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
স্যাকরা ডেকে দেখব নিজে
আসল কিম্বা কম্‌দরী
সোনায় হবে সোহাগা যে
বৌ যদি হয় সুন্দরী।

তোমরা সবে শুধাও তবে—
আমিই বা কোন কার্তিক !
প্রশ্ন শুনে কোথায় যাব
বন্ধ দেখি চার দিক ।
মানতে হলো দরকারটা
উভয়তই আর্থিক ।
স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর
মাইনের নাম কার্তিক ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৪)

বেনামী বন্দর

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড় !
মাল বয়ে-বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড় ।

কূলহীন যত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো-পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,

যত হয়রান লবেজান তরী
বরখাস্ত্ হল ভাই,
পাঁজরায় খেয়ে চিড়্;
মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
সেই—অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভিড়।

দুনিয়ায় কড়া চৌকিদারী যে ভাই
হুঁসিয়ার সদাগরী,
হালে যার পানি মিলে নাক' আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি'!

কোমরের জোর ক'মে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধ'রে গেল কাঠে, আর যার
কল্‌জেটা গেল ফেটে,
জনমের মতো জখম হ'ল যে যুঝে;
সওদাগরের জেটিতে জেটিতে
খাতাঞ্চি-খানা ঢুঁড়ে,
কোনো দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাদের নাম পাবে নাক' খুঁজে!

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভিড়,—
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে;
জোড় গেল খুলে,

ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়,
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়

ছাদে যেওনাকো

ছাদে যেওনাকো, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানাহীন !
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন !

তার চেয়ে এসো বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে,
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন, লাগিবে ভালো।

তারপরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেও ;
—ঘরের বাতিটি জ্বালা হয় নাই আধো আঁধার।
যা দেখিব তার বেশি যেন সেথা কি রয়েছেও,
মনে হবে যেন চোখের সাগর, সেও অপার।

যদি খুশি হয়, কাছে স'রে এসো, বাড়ায়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও ;
সুবাসিত চুল, সেই হবে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাবো প্রিয়তম তারকাটিও।

নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক, আর যা-কিছু চেনা,
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি' ;

মুহূর্তগুলি মন্থন করি' উঠে যে ফেনা

তাহারি নেশায় সব সংশয় রবো পাশরি'।

সীমাহীন ধাঁধা ধু-ধু করে সখি উপরে নিচে,

রচো নিরন্ধ্র গাঢ় চেতনার ক্ষণিক নীড় ;

স্বপ্নহরণ মহাকাশ হোথা নিশ্বসিছে,

এই ক্ষণ-সুখ-প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।

ছাদে যেওনাকো সেখানে আকাশ অনেক বড়,

সীমানাহীন !

তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব

হবে বিলীন॥

পথ

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—

কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,

খোরাশান থেকে বাদকৃশান,

পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।

শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,

চমরীর খুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা।

বাদকৃশানের চুনি আর খোটানের নীলার নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,

ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,

লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ—

লাদকের কস্তুরির গন্ধ যেখানে আজো আছে লেগে পুরানো

স্মৃতির মতো।

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি ;—

আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল-করা

দু-ধারের দীর্ঘ দেওয়ালের
শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায়-ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো।
ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,
ঝিলমিল-দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থামা,
ধূপের গন্ধে সুরভি ; দেবায়তনের দ্বারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ।

ভয়ে-ভয়ে স্মরণ করি সে-পথ ;—
ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের 'ঠোরি' ;-
যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম পায়ে মাড়ানো।
যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ ;
অন্ধকারে শানিত চোখ চমকায়।
যে-পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতার-বাহিনীর অশ্বক্ষুর-বিক্ষত;
করোটি-কঠিন যে-পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।

স্বপ্ন দেখি সে-পথের
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি॥

শস্য-প্রশস্তি

মাঠের শস্য গৃহে এল—
তার স্তোত্র রচনা করো কবি।

মানুষ ও পশু, আনন্দের বোঝার ভারে নত হ'য়ে এল
গৃহে ফিরে,
মরাই বোঝাই হ'ল।

মানুষ আরেকবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে,
পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে,
ভারতে,···ফ্রান্সে,···নীল নদীর তীরে,···কানাডায়—

মৃত্তিকা মানুষকে অর্ঘ্য দিলে।
কেউ দিলে মমতায় মাতার মতো আপনা হ'তে,
কেউ অনিচ্ছায় কৃপণের মতো দিলে মানুষের পীড়নে,
সলজ্জ প্রিয়ার মতো কেউ নিজেকে গোপন রেখেছিলো
এতটুকু ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

তবু সব মৃত্তিকাই দান করল ;—
মরুপ্রান্তের নির্মম বালুকা-ভূমি আর উচ্ছলিত-সুধা নদী-কূল-ভূমি,
গিরিবেষ্টিত উপত্যকা আর সমতল প্রান্তর,
কালো ও রাঙা মাটি,
কঠিন ও কোমল,
যুবতী ও বৃদ্ধা।

শস্যের চির-নূতন জাতকের পুনরাবৃত্তি করো কবি।
—সবল পেশী ও শানিত লৌহফলকের মিলিত প্রয়াসে
মৃত্তিকা বিদীর্ণ হ'ল কবে,
ভূগর্ভের অন্ধকারে বীজের কারা বিদীর্ণ ক'রে
কবে শিশু-তরু বাহু বাড়ালো আকাশের সন্ধানে,
কবে মেঘ দিলে বৃষ্টির আশীর্বাদ, সূর্য আলোকের আর উত্তাপের ;

মাটি ও আকাশ জীবন-রসের,
কবে ধরণীর লজ্জা দূর হ'ল স্নিগ্ধ শ্যামলতার আবরণে,
আর আবার কবে মানুষ ধরিত্রীকে নিঃস্ব নগ্ন ক'রে রেখে গেল।

মাঠ থেকে শস্য এল গৃহে—ধান্য ও যব, গম ও ভুট্টা, জোয়ারি···
মৃত্তিকা ও মেঘ, সূর্য ও বায়ুর মিলন সার্থক হ'ল।

আকাশের আলো স্তিমিত হ'য়ে এল শ্রান্ত মানুষ ও পশুর সঙ্গে
আনন্দের অবসাদে।
সর্বস্ব রিক্ত প্রান্তরের নিঃশব্দ হাহাকারের ওপর
রাত্রি বুলালে অন্ধকারের সান্ত্বনা।
কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগবে, শস্য বহনের আর বিতরণের
আর হায়, লোভের সংগ্রাম।
আজ শান্তি!

মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।
সমস্ত ভাবীকালের ইতিহাসে, মানবের কীর্তি-কাহিনীর তলায়
অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী লেখা থাকবে নাকি?

শহর

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো;
অতীত কালের অস্থি মুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু
পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে।
হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে
আমার শহর নেমেছিলো কাদামাখা পায়ে
এই তো সেদিন নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে

এই তো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূর
অনেক শিশির ঝ'রে গেছে,
তাতিয়ে গেছে কত-না রোদ্দুর।

অনেক ধুলোয় মলিন পা তার
অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ।
আমার শহর ভুলে গেছে
তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।

তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা ঝরার দিন
দমকা হাওয়া থেকে-থেকে
ছাদ ছাড়ানো গাছের মাথায় লাগে
আমার শহর খানিক বুঝি
ঝিমিয়ে পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।

চিমনি তোলা ঊর্ধ্বমুখে আকাশ পানে চেয়ে
কি ভাবে সে-ই জানে!
ভেবে-ভেবে পায় কি নিজের মানে?
পোল বেঁধেছে কল ফেঁদেছে
বসিয়ে বাজার হাট
রাস্তা পেতে মেলেছে ঢের রং-বেরং-এর ঠাট;
তবু যেন জংলা আদিম জলা
জুড়ে আছে আজো বুকের তলা॥

কাক ডাকে

খাঁখাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর;
আকাশ উপুড় ক'রে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ককণ্ঠ কাক!
গান নয়, সুর নয়,

প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

মানুষের কথা বুঝি শুনেছি সকলই,
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
—বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পার হ'য়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্মল।

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,
সে-শব্দের ধু-ধু-করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।

আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে প'ড়ে,
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রসঙ্গ প্রচুর
মন জুড়ে রবে।

ক্ষণে-ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে ॥

যদিও মেঘ চরাই

হয়তো আকাশে শুধুই মেঘ চরাই,
কখনো বৃষ্টি কখনো আলো ছড়াই
অথবা রং চড়াই।
তবুও ভেবো না ভেবো না
যার যা খাজনা দেবো না ;
খেতের ফসল আমিও কেটেছি
শূন্য নয় মরাই।

যদিও বাঁধন না মেনে হই উধাও,
গরল যেমন তেমন চাখি সুধাও,
কিংবা যা-কিছু দাও।
তবুও ভেবো না ভেবো না,
মেলায় মুজরো নেবো না ;
দল-ছাড়া ব'লে বদলেছি কি না
ও-কথা মিছে শুধাও ॥

মুখ

একটা মুখ কাঁদায় হ'য়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোস 'পরে হাসায়।

খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায় !
কার সে মুখ, কার ?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার !

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়,
ঝুমকোলতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভ'রে,
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরে-ই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব ক'রে পুঁজি যা আছে ভাঙায়
তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই ক'রে রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার ?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার ॥

হেমচন্দ্র বাগচী

(১৯০৪)

মনগহনী

(অংশ)

বনে আর ইটমাঠকোঠার মধ্যে
থাকতেন মধুপিসিমা।
আর তেঁতুল ফুলে ভরা
নিমনিষিন্দের বনে

পোড়ো ভিটে
তিত্‌কি নালিমের ক্ষেতে
থাকতেন আর একজন।

পথে যেতে যেতে
যেন বাঁশি শুনি
কোন সে দিনের বাঁশি।
আর কুমড়ো বনে
বাগবাগিচার ধারে
কাঁকুড় ক্ষেতে
আর এমনি যেতে যেতে পেতে পেতে
চলেছি।...
চলা আর গান গাওয়া...
এখন নালিমের ক্ষেতের রাঙাকর্তামার কথা
ভিজে ঠাণ্ডা তামাকপোড়ার গন্ধে ভরা
মাঠকোঠা ঘরে থাকতেন রাঙাকর্তামা।
তাঁর ওখানে পড়তাম চণ্ডীদাসের পদাবলী,
জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

বকুলবনের পথে
সেদিনের বাঁশি বাজে।
রাঙাকর্তামার ঘরে
কী যেন গন্ধ ভরে,
কী যেন আলো আসে
সিক্ত দিনের মনকুসুমের
সুরভিত নিঃশ্বাসে।
বকুলবনের মধ্য দিয়ে
রাধা যাবেন গোপন অভিসারে
কুশ নদীর ধারে।

নন্দ বললেন শ্রীরাধাকে
'গহনী মনগহনী থেকে
শ্রীকৃষ্ণকে আনো
তাঁকে জানো।
বনে-বনে ঘুরে-ঘুরে দূরে-দূরে
যেন হারিয়ে ফেলো না আপনাকে।'

মুড়াগাছা স্টেশনের পাশে উত্তরে যেতে বামদিকে
একটা বাড়ি দেখেছিলাম ছোটতে
তাতে কত লোকজন আর ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে,
সামনেটা ফুলের বাগান
বাতাবি নেবুফুলের গাছ,
কামিনীফুলের গাছ
আর মেহেদির ঝোপ।
আর একটি ছোট সাদা গেট
সন্ধ্যার অন্ধকারে কিংবা সকালে ট্রেনে যেতে-যেতে
বাড়িটি বেশ লাগত দেখতে।
অনেক দিন পর আবার সেই পথ দিয়ে যাই,
দেখি বাড়িটি নেই, ভেঙে চুরে গেছে।
লোকজন নেই, গেট ভাঙা।
গরু-ছাগল ঢুকে বাগান নষ্ট ক'রে দিয়েছে,
রেলিং পড়েছে ভেঙে।
ট্রেনে যেতে-যেতে মনে হয়, কোথায় গেল তারা
যারা এখানে ছিল ?

উদাস প্রান্তর ধু-ধু—
ঘন অন্ধকারে
ট্রেনে যেতে-যেতে বাঁ দিকে তাকালে

আর-একটা রক্তাভ ভাঙা বাড়ি
তার উপরটা যেন গম্বুজাকার।
নির্জন অন্ধকারে কিসের যেন ভয়।
হয়ত প্রেতলোকবাসিনীরা তার মধ্যে ঘুরছে
মাঝে-মাঝে তাদের দীর্ঘশ্বাস বন-বনানীকে কাঁপিয়ে তুলছে যেন।
মনে হয় এক নিঃসীম মহাস্থদূরতা গঙ্গা-জলাঙ্গীর
বালুতটকিনারে গিয়ে মিশেছে।

আলোকিত দালানে রক্তকমল ধূপগুগগুল,
কুশাসনে পুরুত পূজোয় বসেছেন,
মন্ত্রোচ্চারণে মহাকালীর আরতি হচ্ছে।
···বলির জন্যে কাঁপছে ছাগশিশু!
উৎসর্গ হ'য়ে যাওয়ার পর
শাণিত খড়্গ দেখানো হচ্ছে তাকে···
তারপর শোনা গেল ছাগশিশু মুক্তি পেয়েছে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১৯০৬)

মায়া

তোমার দেহ উঠ্‌তি ধানের মঞ্জরী।
আঁটো গড়ন, নধর চিকন, কচি কাঁপন শিষের
কেমন ক'রে ধরি?

তোমার দেহ রেশ্‌মী সুতোর জাল।
কামনারই ঠাসবুননে ময়ূরকণ্ঠী চেলি
পরবো কত কাল?

তোমার দেহ উল্কা-রাতের মেঘ।
আকাশ জুড়ে মরছে উড়ে, পুড়ছে পাথর ছাই
হারিয়ে গেছে বেগ!

তোমার দেহ আরব রাতের দেশ।
স্তব্ধ শীতল সুপ্তি-নিতল। সুর্মা-চোখের যাদু
সূর্যালোকেই শেষ!

হুমায়ুন কবির

(১৯০৬)

চতুর্দশপদী

এক

দক্ষিণে পর্বতখানি ব্যগ্র হ'য়ে তীক্ষ্ণ নাসা মেলি'
সমুদ্রে পড়েছে ঝুঁকে। আদিমকালের অতিকায়
বিস্মৃত সরিস্রপশু প্রাণঘাতী বিপুল তৃষায়
উদ্‌গ্রীব আবেগে দিল সিন্ধুজলে আপনারে ফেলি'।
মাংসপেশীপুষ্ট দৃঢ় রোমহীন দীর্ঘ গ্রীবাখানি
রেখাসম প্রসারিত স্কন্ধ হ'তে সবল প্রয়াসে,
সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গিত শ্রমশান্ত প্রবল নিশ্বাসে
সফেদ ফেনার রেখা দিক হতে দিগন্তরে টানি'।

যুগযুগান্তর পরে সে পশুর নাহি আজি প্রাণ।
সুতীব্র পিয়াসা তবু মেটে নাই সমুদ্রের জলে।
উদ্‌গ্রীব আবেগ তার পর্বতের শীতল কঠিন
প্রস্তর-রেখার মাঝে জেগে থাকে দীর্ঘ রাত্রিদিন।
তাই আজো অগ্নি-দগ্ধ নিদাঘের দীপ্ত সূর্য তলে
পিপাসা শান্তির পথ একমনে করিছে সন্ধান ॥

দুই

শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে পথে তার
শত শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।
তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি' চলিয়াছে বনে,—
সীতার বিরহভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বসিয়া ওঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।

চমকি' উঠিনু জাগি'। তপ্ত নিদাঘের
মূর্ছিত ভুবন ভরি' রৌদ্রানল জ্বলে।
স্টেশন-অঙ্গনে ডাকে গ্রীষ্মাতুর স্বরে
অযোধ্যার নাম। ধূসর ধূলির পরে
বসে আছে বানরের দল। দূরে ঝলে
সূর্যালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের ॥

অজিত দত্ত

(১৯০৭)

মালতী, তোমার মন

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।
জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না ;
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল বিহঙ্গম উড়ে' যায়।
অবিশ্রান্ত গতি
পাখার ঝাপটে তার নিবে যায় উল্কার প্রদীপ
লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি।
তবু আমি সেই মহা বায়ুস্রোতে খ'সে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত।
সে-আকাশ তোমার অন্তর
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর॥

যদি তাই হয়

একবার মনে হয়, দূরে—বহুদূরে—শাল, তাল,
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া-ম্লান দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোন দিন এসে
আঁখি হতে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোন কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে ;
মোদের জানালাপথে ব'য়ে যাক পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনও যদি ভেসে আসে নীলাভ শরৎ
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি কভু মোহ আনে
সে চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি' ॥

নষ্টচাঁদ

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত,
ক'বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত।
মুখোমুখি বসে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায়
দম্পতি-সুখ বলো হয় কার ?
সংসার-ধর্মেতে যে মেয়েরা মন দেয়
পৃথিবীতে তাদেরি তো জয়কার।

মেয়েমানুষের বেশি মন থাকা উচিত না,
আমাদের মন তাই পারেনিকো সামলে।
রুদ্র-গ্রীষ্মে আকাশে থাকেই তো তৃষ্ণা
সব মিটে যাবে চোখের বর্ষা নামলে।
দুটো পয়সার সাশ্রয় কিসে হবে
সেদিকে বরং পারো যদি চোখ রাখতে,
বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে ও বর্তে রবে
পাকা-বাড়ি ক'রে সেখানে পারবে থাকতে।

শখ-টখ যতো সবই জেনো ছেলেমানষি
কুড়ির পরে কি ওসব রাখতে আছে ;

জীবন তো নয় সুখের জোয়ারে পানসি
আসল প্রশ্ন প্রাণটা কি ভাবে বাঁচে।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি
আগ্নেয়-গিরি মেঘের চূড়ায় গলিত চাঁদের ধারা।
পাশ ফিরে শুই ; চাঁদের ভেল্কি সবই জানা গেছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাতই মিথ্যে আকাশ-ছড়ানো তারা।
তুমি পাশে থাকো রুপোর কাঠিতে মূর্ছিতা চিরদিন—
গৃহিণী-সচিব-শিষ্যা এবং—এবং কি জানি কী যে,
জানি না, জানতে চাইনে, জানলে রোজগার হবে ক্ষীণ,
চাঁদ তো উপোসে মরে না ; কিন্তু বেঁচে থাকা চাই নিজে॥

পদ্য

বদ্যিনাথও পদ্য লেখে,
আপন চোখে আসচি দেখে।
চোদ্দ খানা ডিক্‌সনারি
চলন্তিকা সঙ্গে তারি
সামনে থাকে, তার উপরে
দু'জন ডি-লিট্ মাইনে ক'রে
কাছেই আছে : কখন কী যে
আটকে যাবে, বদ্যি নিজে
তাই কি জানে ? এই তো সেদিন
বদ্যি বলে, "মিল খুঁজে দিন
'নিস্‌নি' সনে" ; অমনি তারা
কাগজ ঘেঁটে একশো তাড়া
বার করে' দেয় 'ধ্বস্থি'। তবে
বদ্যি মেলায় সগৌরবে॥

সুনীলচন্দ্র সরকার

(১৯০৭)

কেঁচো চেয়েছিল

কেঁচো চেয়েছিল মাটিকে জানতে।
খানা খেত খাল খন্দ খোঁদলে
লুটিয়ে মাটির দেহলি প্রান্তে।
কেঁচো চেয়েছিল মাটিকে জানতে।

পাথুরে, দো-আঁশ, বেলে ও এঁটেলে
কত ঢিল ঢেলা দেখেছিল ঠেলে।
ঢুকে পড়েছিল শত সুড়ঙ্গে
নীচের খবর উপরে আনতে।

শুকানো ধুলার অসুখে সে ধুঁকে
আরো সেঁধিয়েছে মাটি-মার বুকে,
মেতে বেড়িয়েছে বর্ষা-বাদলে
কাদায় শরীর টানতে-টানতে।

পেল না মাটিকে কাদায় গড়িয়ে,
পাঁক গিলে, মেখে, আঁকড়ে জড়িয়ে ;
তখন মাটির দানার ধাঁধাকে
শরীরের রসে চেয়েছে ভানতে।

শেষে মরে গেল। মাটির নাটের
ভিতরে কি পালা পেল না তো টের ;
মাটির সঙ্গে মাটি হ'য়ে মিশে
গেল কি মাটিকে সালিশি মানতে ॥

বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮)

দময়ন্তী

বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা। দাম্ভিক যৌবন
মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ,
তারার সেনানী তারই রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।
উদ্ধত সে,
নগণ্য সংকল্প তার নষ্ট হ'লে অদৃষ্টের দোষে
বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে
ক্ষত করে :
'আমি হৃতস্বার্থ, তাই সূর্য কেন্দ্রচ্যুত।'

সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন।
সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথ-বনে
কাটায়েছি। সেই রাত্রি, পুঞ্জ-পুঞ্জ বসন্তের মন্থিত অমৃত
যেদিন শরীরে তোর মুঞ্জরিবে, রে কন্যা আমার,
তোর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে দেবত্রয় আসিবে সেদিন,
স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি, কালান্তক যম।

স্বর্গ তোরে চায়, যজ্ঞ তোরে চায়, মৃত্যু তোরে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারই সংগোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,

যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও।'

ফিরে যাবে দেবগণ। ওরে দেববিজয়িনী
যৌবনগর্বিণী কন্যা,
রে কন্যা আমার,
সেদিন মুখশ্রী তোর পূর্ণিমার মতো
আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দু'জনের চোখে—
নয়, নয় বিচ্ছেদের শোকে,
আনন্দে, স্মৃতির স্রোতে, অতীতের উত্তরাধিকারে।

শোন্ তোরে বলি :
যে-ত্রিবলী
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে-বন্ধুর
শরীর লজ্জিত, আজো, আপনার আকর্ষণ জেনে,
একদিন তার স্বয়ংবরে
স্বয়ং মহেন্দ্র, যম, বৈশ্বানরে
ক্ষুণ্ণ ক'রে যে-মর যৌবন
হয়েছিলো জয়ী,
তার দম্ভে শ্বেত কেশ আজ ব্যঙ্গ করে,
কালাঙ্কিত কপোলে ললাটে
দেবতারই বিপরীত প্রতিপত্তি রটে।

তবু জৈব জাদু ব্যর্থ নয়।
যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে-সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।

যে-মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবী
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বঘ্ন তিমির-তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
অমনি থমকে কাল ; অদৃষ্টের করাল কুহেলি
দীর্ণ ক'রে আদিম পুরুষ।
লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে ;
নির্ভয়ে উতরে
স্বগৃহে, স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিন তীরে
পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে।
শিহরে, শিহরে
আজিও সে-কথা মনে হ'লে
এ-জীর্ণ তনুর অন্তরালে
অকাল কঙ্কাল—
যে-মুহূর্তে তরঙ্গিত সময়-সলিলে
দ্বিখণ্ডিত হ'লো ক্রূর অদৃষ্টের শিলা,
ম্লান হ'লো হুতাশন, ব্যর্থ হ'লো যমদণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ,-
বিশ্বাস না হয় যদি, জননীরে শুধায়ে দেখিস।

কিন্তু শেষ শিক্ষা আছে বাকি।
ক্লান্ত আজ স্বেচ্ছাচারী অজ্ঞান বৈশাখী
একদিন উন্মাদ নৃত্যের তালে-তালে
পঞ্জরে যে মুঞ্জরেছে, সংকীর্ণ কঙ্কালে
করেছে সকাম।
স্তব্ধ আজ রলরোল ; বিলোল আকাশগঙ্গা
ঝরে না ঝরে না আর নীহারিকা-স্বপ্নাকুল উৎসুক-নিশীথে ;
অন্ধকারে, চন্দ্রালোকে, সন্ধ্যায় নিভৃতে
শরীরসীমান্ত বার-বার
বিচূর্ণ হয় না আর
উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।

জরার জটিল রেখা শরীরেরে
কঠিন পাথরে ঘেরে ;
এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমনীয়,
নিশ্চিন্ত আমার সত্তা ; অনর্গল, অক্লান্ত ইন্দ্রিয়
এতদিনে রুদ্ধ হ'লো। অপরাহ্ন ছিন্ন-অঙ্গ মেঘে
সবুজ হলুদ নীলে পশ্চিমে অন্তিম
বাসর সাজালো।
সূর্যাস্তের যাদুকর আলোর আয়না
হাতে নিয়ে সন্ধ্যা নামে : অন্ধকারে জ্বলে শুধু ছায়ার, স্মৃতির
অফুরন্ত ভিড়। এ-শরীর অবলুপ্ত জান্তব যৌবনে
হঠাৎ হারায়। কল্পনা বাড়ায় প্রেত-হাত,
দীর্ঘ ছায়া পার হ'য়ে অতীতেরে আনে সে ছিনায়ে।
সেখানে এখন
বিনষ্ট সংকল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন,
স্বার্থ-কেন্দ্র-চ্যুত বিশ্ব ফিরেছে আদিম মহিমায়।
জীবনের সমাপ্তিসীমায়
শেষ শিক্ষা এ-ই ছিলো বাকি।

শিখেছি বৃদ্ধের বিদ্যা। হাস্যকর, নশ্বর, একাকী,
ব'সে-ব'সে চেয়ে দেখি দাম্ভিক যুবকদল চলে কলোচ্ছ্বাসে,
আর দেখি তোরে, ওরে
দেব-বিজয়িনী যৌবনগর্বিনী কন্যা, রে কন্যা আমার !
সহস্র নলের ছল ব্যর্থ হবে, ফিরে যাবে
ইন্দ্র, যম, বৈশ্বানর ; দুঃখের কুটিল
অরণ্য পুষ্পিত হবে চৈত্ররথ-বনে
তোর যৌবনেরে ঘিরে। সেদিন আমার
কাল-কলঙ্কিত, তুচ্ছ শরীরে তাকায়ে
এ-কথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না—
সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়।

কবে এলো হংসদূত, ক'য়ে গেলো প্রিয়তম নাম,
স্বতঃশ্লথ নীবীবন্ধে আনন্দের ঢেউ তুলে
সেদিন কখনো ভুলে
ওরে স্বয়ম্বরা, তোর এ-কথা হবে না মনে—
যে-নারীর দেহ এই পৃথিবীতে তোর সিংহদ্বার
এ-প্রণয় তারই উত্তরাধিকার,
এ-বিশ্ববিজয় তারই কাহিনীর পুনরভিনয়।

তাই তো বিনয়
হৃতশক্তি বৃদ্ধের সম্বল।
অপেক্ষার যে-কলাকৌশল
ধৈর্যের যে-চতুরালি ধনী যৌবনের
ব্যঙ্গের বিষয়, দরিদ্র বার্ধক্য তাই দিয়ে
জীবনের ব্যবসার প্রাক্-প্রালয়িক
ভবিষ্যৎহীন দিনগুলি
সযত্নে সাজায়। অবাস্তব, তুচ্ছ, অনর্থক,
পরিত্যক্ত, বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এ-ই আমি, এ-ই আমি। তাই বলি
বলি বার-বার,
'অপেক্ষা শেখাও,
শেখাও ধৈর্যের নীরবতা,
এবিশ্বে ফিরায়ে দাও আদিম মহিমা।
আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড়,
তারার জ্বলন্ত নৃত্য, পৃথিবীতে সবুজের খেলা,
আকাশের সোনালি-নীলের মেলা ;
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু ; আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—'

আজ তোরে দেখে,
হে নবযৌবনা কন্যা, রে কন্যা আমার,
আমার প্রেমের মুক্তি। দেখি চেয়ে-চেয়ে—
আজিও করাল কাল ঘুমন্ত যেখানে—
পূর্ণিমা-মুখশ্রী তোর, পার্থিব অমরা।
তার জরা
সূর্যের মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত, অথচ
অসম্ভব মনে হয়; মনে হয়
কাল, তাও তুচ্ছ যেন, এ বিশ্বের স্থবির ঘটনা,
রূপান্তরহীন।
লক্ষ রাত্রি, লক্ষ দিন
কেটে যায়—না কি আসে ফিরে-ফিরে
মৃত্তিকার মূর্তি দিতে চিরন্তনী দময়ন্তীরে?

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেল-সারি
বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।

তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস শর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব ॥

অন্য প্রভু

রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরে : শুধু নয় বাংলার জঙ্গলে
আগুন-রঙের বাঘ, আল্পসের কল্পনা-কৈলাসে
দারুণ ঈগল, বারুণী বরফে তপ্ত তিমি, শুধু
দীপ্ত দৃপ্ত দুর্জয়েরে নয়, দিয়েছো সবারে স্বত্ব
সহজাত রাজত্বের : ঘোলা-জল ধোবার ডোবায়
গলা-ডোবা কালো মোষ ভাদ্রের রোদ্দুরে, গলা-ফোলা, গলা-খোলা ব্যাং
বৃষ্টিশেষ বিকেলের হলুদ রোদ্দুরে, মেঘলা দুপুরে
আকাশে একলা কাক, কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি,
রাক্ষস টিকটিকি :—সকলেরে রাজত্ব দিয়েছ, প্রভু, সকলেরই
প্রভুত্ব নিয়েছ মেনে।···এ-স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি
বঞ্চিত শুধু কি আমি ?···আমি কবি !···শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত···নির্বাসিত ?   অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে ?   শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস ?···সত্যি তা-ই ?···না কি আমি, কবি-আমি,
কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্য, হীন প্রভু মেনে নিয়ে ॥

রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।

জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন ॥

বৃষ্টি

এসো বৃষ্টি,
এসো তুমি অতল ভূতলে রুদ্ধ স্তম্ভিত পাষাণে
দীর্ঘ দগ্ধ প্রতীক্ষার পরে।
এসো যেথা তপ্তবাষ্পনিশ্বাসী পাহাড়
অনন্তকালের ধৈর্য ধূমল অক্ষরে
লিখে যায় ক্লেদময় মেদগাত্র-'পরে।
এসো সেই প্রাথমিক সুপ্তির পাথরে
সৃষ্টির আদিম বীজ যার বক্ষে লীন।
এসো তুমি অর্ধ-সৃষ্ট অস্পষ্ট অতলে
মাটি যেথা জল হ'য়ে ঝরে, জল যেথা অগ্নি হ'য়ে জ্বলে,
অগ্নি যেথা বায়ু হ'য়ে শূন্যে মিশে যায়।
এসো মগ্ন কল্পনার মূলে, এসো তুমি সত্তার শিকড়ে,
মুক্ত করো সৃষ্টির উদ্দাম বীজ,
ছিন্ন করো স্তব্ধতার পাষাণ-শৃঙ্খল।
তোমার ঝঙ্কার স্বরে শূন্যতার কুহরে-কুহরে
জন্মের প্রচণ্ড মন্ত্র উচ্চারিত হোক;
ভেসে যাক স্খলিত পাহাড়
বিগলিত বস্তুর বন্যায়।
মাটি হোক কঠিন কোমল,
জল হোক তরল শীতল,
অগ্নি হোক উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল,
রূপ হোক, ছন্দ হোক, সৃষ্টি হোক, হোক বিশ্বলোক ॥

শ্রাবণ

আমার মনের অবচেতনের তিমিরে
কত-যে কথার জোনাকি
লাজুক আলোকে খুঁজে-খুঁজে ফেরে তোমারে—
শ্রাবণ, তুমি তা জানো কি ?

খরবরিষণঝংকৃত ঘন নিশীথে
মরে সে গুমরি'-গুমরি'
ঝরঝর স্বরে নিজেরে নিবিড়ে মেশাতে :
শ্রাবণ, এ-স্বর তোমারই ।

মেঘমন্থন মন্দ্র তোমার শাণিত
লাল বিদ্যুতে বিলসে,
ছায়াচ্ছন্ন নীল দিগন্ত শুনি-তো
তোমারি কাহিনী বলে সে ।

হে কবি-শ্রাবণ, তোমার পূর্ণ প্রতিভা
আমারে কখনো ছোঁবে না ?
তারে-তারে এলো থরোথরো স্বর যদি-বা
বাণীহীনা র'বে কি বীণা ?

আদিম আঁধারে বাঁধা হীরকের যে-খনি
তোমারেই, কবি, দেবো তা,
ধাতুর হাতুড়ি-আঘাতে জাগবে যখনই
শুভ্রশিখার কবিতা ॥

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

(১৯০৯)

পণ্ডিচেরীর ঈশানকোণের প্রান্তর

কোন
সঙ্গোপন
থেকে এলো, এই উজ্জ্বল
শ্যামল
বিন্দুর শিখা!
এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত
শুষ্ক রুধির-সঞ্চিত
প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ?
অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান
কোন অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত—
এই গরল-কুণ্ডলিত
ভুজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে
প্রস্ফুটিত মাধুরীর তরঙ্গে!

যোজনের পর
যোজন বিস্তৃত প্রান্তর;
আজ সকাল বেলা
এসেছি এখানে। দূরে দূরে দেখা যায় রুক্ষ মাটির স্তূপের মেলা,
তারি উপর দণ্ডের মতো দাঁড়ানো জমাটবাঁধা পাথরকুচির চাঙড়া, যেন ক্ষিপ্ত মুণ্ড
নাসাখড়্গাধারী গণ্ডার, যেন উদ্যত শুণ্ড
মদমত্ত মাতঙ্গের মতো।

রাক্ষসী মেদিনী অবিরত
বৎসরে বৎসরে
নিজেই নিজেকে গ্রাস ক'রে ক'রে

সৃষ্টি ক'রেছে এই আরক্তদশন
বুভুক্ষার গহ্বর প্রাঙ্গণ।

বক্ষে তার
বালু-কঙ্করের বঙ্কিত পন্থার
কঙ্কাল।
তারি একপাশে ভস্ম-ভাল
শ্মশান ; প'ড়ে আছে দগ্ধ-শেষ চিতার
নিরুত্তাপ পাংশু অঙ্গার,
জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কন্থার
রাশি, ভগ্ন কলসের কানা,
নর-কপালের করোটী, শকুনীর নখর-চিহ্ন, শব-লুব্ধ সংগ্রামে পরাজিত মৃত
বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা ;
বসে আছে অপরাজেয়
লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী কৃষ্ণকায় সারমেয়।

তবু সেখানে সর্বজয়ী জীবনের
বিকাশের
লিখা
এনেছে দুর্লভ তৃণ-মঞ্জরী, বিন্দু বিন্দু সবুজ গুল্ম-শিখা !—
আর
দুর্দম দুর্বার
মর্ত-বিদ্রোহী তাল-বিটপীর বৃন্দ ; তাদের
অটল স্বরূপের
অভিযান তুলেছে ঊর্ধ্বের
উদ্দেশে, যেন সহস্রশির
বাসুকির
শত শত ফণা রসাতল ভেদ ক'রে
উঠেছে দুলে অনন্ত অম্বরে,
তারা
পান করে যেন সেই সুনীল সুধার অক্ষর-ধারা ,

যেন কোন খেয়ালী চিত্রকর, আষাঢ়ের
ঘনীভূত মেঘের
রঙের পাত্র শূন্য ক'রে নিয়ে
ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো বিশাল তুলি দিয়ে
ঐ অভ্রংলিহ রেখার সারি করেছে অঙ্কিত,
তারি চূড়ায়
শাখায় শাখায়
করেছে তরঙ্গিত
হরিদ্বর্ণ রশ্মিবিকীর্ণ তীক্ষ্ণ-ধার
পাতার
ত্রিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকাপুঞ্জ ; সেখানে বিষাণ
বাজায় বাতাস, দোলে বিজয় নিশান ;

তাদের
সর্ব অঙ্গে পুরু ইস্পাতের
চক্রাকার আবর্তনের
কালজয়ী আবরণ ;
নলকূপের মতো তাদের মূল—
এই উষরপিণ্ডপৃথুল
পৃথিবীর জঠরের অতল-তলে
পলে পলে
ক'রেছে সঞ্চিত
মর্ত-শ্মশান-মন্থিত
অমৃত।

হে সম্রাট শিল্পী, সুন্দর ! কোন অচিন্ত্য লোকের
রহস্যের
বেদিকায় ব'সে আছ তুমি ?
এই মরু-বাস্তব ভূমি
তোমার
নিমগ্ন কল্পনার

নির্লিপ্ত আনন্দের
পরম-বস্তু-রসের
রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।
জ্যোতির্ময়!
দাও দীক্ষা, অপূর্ব রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায়;
যে-মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়
বিলুপ্ত হবে মেদিনীর
মাতঙ্গ প্রকৃতির
মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার
বুভুক্ষার
বিক্ষুব্ধ আসক্তি;
জীবনের অভিব্যক্তি
হবে মূর্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বরচুম্বিত আত্মার মতো, বর্তিকা
জ্বলবে অন্তরে
ঐ ওজস্বান তৃণ-শিখার অক্ষরে।
দাও তোমার বর্ণমন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নির্ঝরিত তুলিকা,
স্পর্শে যার
দীর্ণ ক'রে আমার
কঠিন প্রাণ-খণ্ডের শিলা
মুঞ্জরিত হবে তোমার
অমর্ত-মালঞ্চের
মাধুর্য মন্দারের
সৌন্দর্য লীলা॥

অরুণ মিত্র

(১৯০৯)

চিতা

চিতার আলোয় আনাচ-কানাচ ফর্সা হয়ে এল ;
একটা দুর্দান্ত ভয়
যেখানে ওত পেতে থাকত ফুলে উঠত
মাটিতে ন্যাজের বাড়ি মারত
সেখানে কিছু নেই।

তাকে অনুভব করা যেত :
ক্ষেতের আলের কিনারে উই ঢিবির ফোকরে
কারখানায় মেশিনের ইস্ক্রুপের খাঁজে
ডেসকের উপর লেজারের জাব্দা পাল্লায়
তার মারমুখো অস্তিত্ব গরগর করত।

প্রেমের স্তব মন্দির হয়ে উঠেছিল
কিন্তু দমকা ভয়ে ধ্ব'সে পড়েছে তাসের ঘরের মতো,
আর কত যে শোচনীয় ভস্মস্তূপ পড়ে থাকল ইতস্তত,
প্রত্নতত্ত্বের ধুলোমাখা পবিত্র সব গম্বুজ ;
লতার মতো যারা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছিল
তারা চমকে সাপের ছোঁয়া লাগিয়েছে,
তাদের মুখে চেরা কথার কামড়,
দেখা যাবে চেতনার বিষাক্তদলগুলোয় তারা কিলবিল করছে।

দু' মুঠো লাল ভাতের স্বাদে চোখের জলের নুন এখনও মাখা আছে,
এই কয়েক মিনিট আগে সবাই তাতে মুখ দিয়েছে
এবং যথারীতি কুঁজো হয়ে ঘামের ফোঁটা ফেলে জমেছে এসে মশানে।

ঘানি ঘোরার টালে
লাঙলের ফালে
লোহা-গলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে ? কে ?

চিঠিপত্রে জমাখরচে দলিলদস্তাবেজে
কালোহলদে ডোরা
হাড়মাস চিবিয়ে ফেলা শাসানি
একসঙ্গে পাহাড় হয়ে পুড়ছে ;
গনগনে আনাচেকানাচে
সেই বাঁকা অস্পষ্ট দুরন্ত রেখা আর নেই,
চিতার অবিশ্বাস্য আলোয়
এ কোণ ও কোণ ফর্সা হয়ে এল,
সকলের চেহারা ঝলসে উঠেছে
চামড়ায় ধরেছে টান,
আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যাশায় সন্দেহের গভীরতায়
ধনুকের ছিলার মতো টনটন করছে এতগুলো প্রাণী

কে বাঁচে ?
ঘানি ঘোরার টালে
লাঙলের ফালে
লোহা-গলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে ? কে ?

উত্তরমেঘ

ছোট ঘর ঘিরে মেঘাড়ম্বর নিরন্তর ।
রূপকথা হবে জীবন্ত, এই আশা তোমার ।
ভাঙা পালঙ্কে সোনার কাঠির মৃদু পরশ
অঝোর শ্রাবণে লাগে যদি আহা লাগেই আজ !

দুয়ার দিলাম সন্তর্পণে : চতুর্দিক
কাছাকাছি আসে, গাঢ় হ'তে চায় বিনা কথায় ;
আর দেখি হায় তোমার নয়নে দিবাস্বপন।
মুখ গুঁজে থেকে প্রতীক্ষা করে কক্ষকোণ।

মেঘ-পর্বত বাহিরে তুলেছে শ্যাম শিখর।
জানলায় চেয়ে ছ্যাখো অলকার গৃহ অলীক ;
মৌসুমী বায়ু কখনো পাগল, দূরাগতের
হাহাকার বেঁধে ভিতরের ছাদে বারংবার।

ঘোর ভ্রূ-ভঙ্গ তোমার, বিঘ্ন দুঃসহন ;
ছোট্ট একটি বাতায়ন আনে শত বেতাল।
ভুজ-বল্লরী বাড়ালে, বন্ধ কর কি তাও ?
তবে নিঃশ্বাস নেবার কি হবে, কোন্ উপায় ?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠ-বিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্ট দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায় সে আকাঙ্ক্ষাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার। গড়বার, আদর করবার, ফুলে ফলে কাকলিতে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে গেল তা এই ক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে। কতদিন তুষার-শীতল স্রোতের প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উত্তুরে হাওয়ায় সন্ধ্যাঝরা বর্ষণ। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বর্শার বিষ উত্তাল করল তার তিন সমুদ্র, এপার ওপার জুড়ল কান্নার কল্লোল। দাওয়ায় ব'সে আর ছায়াপথে স্বপ্ন পাঠানো যায় না, হারানো তারাগুলো শুধু কাঁটা হয়ে ওঠে আগাছার ঝোপে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায় যন্ত্রণার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে-ওঠা ফুঁপিয়ে-ওঠা আবেগ শরীরের সমস্ত তন্তুতে থরথর করে। সেখানে শান্তি ঝরে না, সান্ত্বনা ঝরে না। ছেলে-ভুলোনো আসরে কাঠ-পুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গী শক্ত হয়ে থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ জয়ের উল্লাস ! তার তাড়নায় আঁকাবাঁকা স্থতোলি নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ বুকের তুষানলের আভায় কালো দিগন্তে পাড়-বোনা, দুর্গের গড়ে সঙিনের চকমকির ফুলকি আর রাজবাগিচার জঙ্গলের চাউনি। আরো বলি চাই। অনেক তো দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর কত ! কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে ?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
কখন ?

এক একটা শান্ত দিন

এক একটা শান্ত দিন নিয়ে বিভোর হই
তাকে মৃদু নদী দিয়ে ঘিরে রাখি
কুয়াশায় মুড়ে রাখি
ভোর-ভোর আলো কিংবা গোধূলির গভীরে নিয়ে যাই
আমার জানাশোনা মানুষেরা স্তিমিত হয়ে হয়ে নিবে যায়
তাদের কথাগুলো হিম হয়ে থাকে
হিম শীতের রোদ আর ছায়া
কোন্ জলের শব্দ
নিস্তব্ধ মাঠ
মনের কপাট খুলে এই সব সংগ্রহ করি।

রাশি রাশি পাতায় আমার উঠোন ঢেকে যায়
রাশি রাশি ঘুম যেন ভর দেয়
সমস্ত চিন্তার উপর
পৃথিবী এক ছবি হয়ে থাকে চোখে
অপলকে তাকে দেখি যতক্ষণ পারা যায়
শুধু বুকের টিপটিপটুকু
তাকে পুষে যেন বেঁচে থাকি ঘুমন্ত শিশুর মতো
আর সব দূর পাখি
শীতের দিন ফেলে উষ্ণ আকাশের দিকে চলে গেল
তারা কি যেন বলে গেল
আহা আমার নিভৃত প্রাণ আমার গুঞ্জন আমার মুগ্ধ নিশ্বাস।

সন্ধ্যা নেমে এলে খেলাঘরে বাতি নেই
তখন হৃদয় জ্বালাতে ইচ্ছে করে মোমের মতো
শত সহস্র সন্ধ্যার ভিতরে এক নিবন্ত শিখা
তার চারি পাশে আদ্যিকালের গল্প
যার দিকে ফিরে মনের আগ্রহ আস্তে আস্তে গ'লে গ'লে ঘুম হয়ে যায়।

এক একটা দিন এমন
সমস্ত তারের ঝনঝন যেন এক দীর্ঘ স্থির রেখা
সমস্ত বিক্ষোভ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
সমস্ত অশ্রু জমাট তুষার ॥

ছয় ঋতু সঞ্চয় করি

ছয় ঋতু সঞ্চয় করি
বছরের পর বছর জমা করি আমাদের চোখের শূন্য কোটরে
একদিন তাদের আদলে আমরা দেখব
হাজার হাজার বর্ণহীন দিনের পর একদিন

একদিন ছয় ঋতুর আদলে তোমাদের দেখব
পৃথিবী পুত্রকন্যা
তোমাদের মুখ।

সেই যৌতুক আমরা চাই
অন্ধ জীবনের কাছে
তারই জন্যে প্রস্তুত হই।

কত যোজন জুড়ে উপুড় হয়ে থাকে মাঠ
কত কথা হারিয়ে চুপ ক'রে থাকে নদী
শহরের পথে কখন গাছের পাতা ঝরে পাতা আসে জানি না
জানি না কেমন ক'রে শিশুরা আগুন পোহায় শীতে
কেমন ক'রে
খুশিতে প্রথম আষাঢ়ের বৃষ্টি নামে
গ্রীষ্মের বেলা ফলের রসে ডগমগ হয়
বিকেলের মেঘে দেখা দেয় সমুদ্রের আভাস
চিনতে পারি না তকতকে নীল আকাশ
কিংবা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুলের কুঁড়ি
তোমাদের আকুল শরীর
যেন ছায়া।

একটা মুহূর্তে তো এর বদল হবে
রক্তে মাংসে মাটিতে জলে সমস্ত মুখ সুডোল হয়ে উঠবে
কালো পর্দা সরিয়ে তোমাদের সম্ভ্রম মূর্তি নেবে
হে পৃথিবী হে পুত্রকন্যা।

অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের চোখের পাতা পড়ে না॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
(১৯০৯)

মণিকুন্তলা

খোঁপায় দিতে কটকি রূপোর ফুল
কতো না ক্ষপা গুনেছি সেই তারা,
আজকে ক্ষ্যাপা হাওয়ায় সমাকুল
চুপিচুপি তোমার চুলের ধারা।

আজকে হঠাৎ ঝরঝরিয়ে পড়ে
ক্ষয়ে-যাওয়া স্মৃতির মতো নীল
অপরাজিতার তন্বী থরে থরে
তোমার চুলের আকাশ অনাবিল।

আমার মনে-পড়ায় তারা আসে
আসে ভালোবাসার ক্ষত-মুখ
চৈত্র-রাঙা সারা কুসুম-মাসে
এমনি তোমার মৌসুমী কৌতুক ॥

প্রেম

মনে থাকবে না!
এই আলো, এ বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ—প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ চেনা
মনে থাকবে না।

তবু কিছু থাকবে কোথাও,
এই আলো এই ছায়া যখন উধাও

বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ
আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন—নেই তা-ও
তখনো হয়তো কিছু থাকবে কোথাও।

তখনো থাকবে ছবি তোমার আমার।
দেখবে পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতোবার
তাকাবে দেখবে যেন আরো কেউ আছে তাকাবার ;
অপলক চোখ যেন কার
তোমার চোখের পাশে—হয়তো আমার ॥

২৬শে জানুয়ারী

একটু সময় দিও, হৃদয়ের খানিক সময়
তাদের সে-ছায়ার উপর—
ছায়া হয়ে গেছে যারা তোমাদের ছায়া দেবে ব'লে।
তোমাদের ছিল ঘর,
নাবিকের দল তারা ভেসে গেছে কতো দূর সমুদ্রের জলে—
হয়তো আসেনি ফিরে,
তাদের মায়ের চোখ, তাদের প্রিয়ার চোখ কতো রাত্রিদিন
জেগেছিল চিহ্নহীন, স্মৃতিহীন সমুদ্রের তীরে ;
তাদের মায়ের চোখ, তাদের প্রিয়ার চোখ
আরেক সমুদ্র রেখে মুছে গেছে গাঢ় অন্ধকারে !
তোমার প্রাঙ্গণে, দ্বারে
জীবনের, মরণের সেই অন্ধকার
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিতে আসেনি কখনো, কোনোবার।
তোমার রোদের গায়ে মাখা ছিল ছায়া
মায়ের চোখের মতো,
প্রিয়ার চোখের মতো রোমাঞ্চিত মায়া,
ছিল রোদ ঘুম-ভাঙা—রোদের নরম কিশলয় !

একটু সময় দিও মন থেকে—যদি মনে লয়—
তাদের এ ক্লান্তির উপর—
ধূলিতে ধূসর যারা মরুযাত্রী ফিরে এলো ঘরে।
তোমারে করেছে প্রদক্ষিণ
বারবার আশ্বিনের ফাল্গুনের সুরভিত দিন ;
তাদের দিগন্তহীন, নিদ্রাহীন, রাত্রির শিয়রে
ছিল মরু-ঝড়।
আকাশে হারিয়ে গেছে তোমাদের স্বপ্নের বলাকা—
নারীর নয়ন হতে রহস্যের শিহরন মাখা।
নিয়েছে অনেক অনুভব ;
তখন তাদের চোখ পুড়ে গেছে রোদের শিখায়
রক্তের লিখায়
ধূসর মরুর ইতিহাসে
রেখে গেছে নামহীন নাম।
তাদের ছিল না কিছু—যা ছিল তা সব—
অকরুণ আগ্নেয় আকাশে
উজ্জ্বল-সূর্যেরে-দেওয়া গভীর প্রণাম॥

যৌবনোত্তর

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো ;
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে রাত্রির মানে ;
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হতে জানে।

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর ;
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর—

তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর—
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক-জীবন ॥

অশোকবিজয় রাহা

(১৯১০)

একটি সন্ধ্যা

বেতারে কা'র সেতার বাজে, বাংলা খবর শেষ,
শুনে শুনে পথ দিয়ে যাই, মনে সুরের রেশ,
মফস্বলের শহরতলি খানিকটা বন-ঘেঁষা,
ঝোপেঝাড়ে সন্ধ্যা নামে বুনো গন্ধে মেশা,
বাঁকের মোড়েই হঠাৎ আসে রাঙা মাটির টিলা,
ওর পিছনে উঁকি মারে পাহাড়টা একশিলা,
শেয়াল-ডাকা রাত্রি আসে যেই আসি ওর কাছে,
বাদুড়গুলা ঝাপ্‌টা মারে কাক-ডুমুরের গাছে,
মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি—আরে !
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে !

চিত্রলেখা

জানে ঐ ছোটো ঠোঁট দুটি
পৃথিবী প্রকাণ্ড এক সূর্য-সেঁকা রুটি
সারাদিন চলে তাই খুঁটে-খুঁটে খাওয়া,
ফাঁকে-ফাঁকে ঘাড় তুলে চাওয়া
গায়ে মাখা হাওয়া

এর কাছে ওর কাছে যাওয়া
কিছুক্ষণ তারস্বরে গাওয়া।

এই শুধু চলে দিনভর
তারপর
সন্ধ্যা হলে চুপি-চুপি ফিরে যাওয়া ঘর
ডালের উপর
খড়ের বাসায় ঢুকে শুয়ে নিঝ্‌ঝুম
ঘাড় গুঁজে ঘুম।

*

গাছের সারির পিছে চুপি-চুপি কখন এখানে
এসেছে শবরী উষা, দাঁড়ায়েছে বনের আড়ালে,
পরেছে বিশাল খোঁপা, সদ্যফোটা রক্তজবা কানে,
বুকের কাঁচুলিখানি বিঁধে আছে মহুয়ার ডালে।

*

ছিন্নমস্তা পৃথিবীকে দেখি :
এখানে মাঠের একধারে
রক্তাক্ত চিৎকারে
পৃথিবীর আত্মহত্যা এ কি ?

চারদিকে ধসা-মাঠ, কাঁকরের স্তূপ
কালের বিদ্রূপ
তারি এক পাশে
শেষ-সূর্য একবার জ্বলে ওঠে পশ্চিম-আকাশে

তীর-বেঁধা রক্তসন্ধ্যা স্রস্ত এলোচুলে
খ'সে পড়ে দিগন্তের মূলে।

*

দিনশেষে এইখানে
পৃথিবীর মৃত্যুর শ্মশানে
খোয়াই আমাকে রোজ টানে।

মনে হয় সারাদিন দাঁড় বেয়ে চলেছি উজানে
সেই ভোর থেকে
দুই তীরে দেখে-দেখে
কত ঘাসে-ঢাকা জমি, কত ঝাউঝাড়
উঁচু-নিচু পাড়
কত পথঘাট
ধান-ভরা মাঠ
সারি-সারি ঘরবাড়ি
কত-যে বিচিত্র নরনারী।

তারপর
দিনশেষে কমে আসে জোয়ারের জোর
পড়ে যায় হাওয়া
থেমে যায় বাওয়া
আবার ভাটার টানে
ফিরে আসি রোজ এইখানে।

*

এই সকালের বুকে একটি সোনার তার বাঁধা
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সাধা।
দিনের আলোর সাথে বীণার মতন
বেজে ওঠে শান্তিনিকেতন
চারদিকে তার
জেগে ওঠে গাছপালা, পাখির ঝংকার
পথে-পথে কাঁপে সেই সুর
বিচিত্র মধুর।

চমকায় সোনালি রোদ্দুর
ডালে-ডালে কচিপাতা হাসে
প্রজাপতি খেলা করে ঘাসে
মুখে-চুলে আলো মেখে ছুটে আসে ছেলেমেয়েদল
পুলক-চঞ্চল॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১৯১০)

রথযাত্রা

তুমি যেন কোন রথের মেলার মুখ
এলোমেলো ঘোরো নাগরদোলার সাথে ;
কাঠের পুতুল—ওঠা-পড়াহীন বুক,
মেডুসা-কঠিন দৃষ্টির শাপ হাতে।
ঘুরে ফিরে তাই ভুলে যাই কেন খুঁজি,
অভিধান খুঁড়ি, খনি বুঝি আছে নিচে।
এতো শালীনতা, এতো বয়সের পুঁজি,
শুধু পাড়াঘোরা-সব হল বুঝি মিছে।
মুখোশ ছাড়ি না, তবু মুখে বলি আহা,
রসবোধ আছে তাই মানুষেরা বাঁচে।
নইলে শুধু ও আত্মশাসনে ঠাসা
মন থাকে ঘেরা ক্ষণভঙ্গুর কাঁচে।
কোনোদিন, জানি, আত্মপ্রসাদ ভেঙে
চুরমার হবে মানুষের গায়ে লেগে।
ধ্বংস-ধূসর অবশেষে যাবে রেঙে
লেন্-এভিনিউ-পার্ক মন্থন-বেগে।

তবু সেই মুখ, ক্লান্ত দিনের পারে
পিছু পিছু কালো রাত্রির মত আসে,
প্রলাপ-প্রখর শানিত মনের ধারে
এলোমেলো ভিড় মেলা ভাঙবার পাশে।
তাই মনে বলি, হায় ঝরে যাওয়া পাতা
আমি তো তোমারই দলে আছি, জান না তা !
জনারণ্যের শহর বালুকা-পাতা
তার নিচে দেখি শিকড় গিয়েছে মরে।

অর্কিড-হাতে নীল ফুল মাথা নাড়ে,
জানালার ফুল মাটির অভাবে বাড়ে,
স্নিগ্ধ হাতের শৌখিন স্নেহ কাড়ে ;
হাওয়ার পৃথিবী হাওয়াতেই যায় ঝরে॥

অরণি

এখনি এখানে এক অরণ্য-সন্ধ্যা নামবে
দেখে নিও পাহাড়ে পাহাড়ে।
অদ্ভুত ভূগোলে, শাল মহুয়া পলাশে
লাল, বন্য দিন ঢুকে যাবে গুহায় গুহায়।
তোমাদের দূর কোলে সমতল শহরের থেকে
সন্ধ্যার বিদ্যুৎ-দ্যুতি ছুটে এসে এসে
ক্লান্ত হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অন্ধকার হয়ে যায়, আর
টিলার উজ্জ্বল ঢেউয়ে জ্বলে ওঠে অরণির সার।
এ সমস্ত ভাবনার পিঠ বেয়ে বেয়ে দিন ডুবে গিয়ে
রাত্রির তোরণ দিয়ে চলে যায় ওপারের দিনে।
সমস্ত পৃথিবী থেকে একটি দিন আয়ু নিভে যায় বুঝি !
তবু কত আয়ু কত জীবনের পারে লেগে লেগে
জ্বলে ওঠে তলহীন সমুদ্রের উজ্জ্বল মাছেদের মত।

যেখান থেকেই আসো—
শহরের গ্রামের বনের, ইতিহাস-সন্ততির মত,
শেষহীন গল্পের নায়ক নায়িকা সব
'আমরা ও তোমরা'র এপারে ওপারে
জীবনের পাড় বুনে চলো।
এই ইতিহাস নামে ভূগোলের রঙ্গমঞ্চে—
মুখোশে মুখের রঙ মানুষে মানুষে,
যুদ্ধে প্রেমে বঞ্চনায়, উৎসবের রঙিন ফানুসে।

তবুও এখানে এক আরণ্যক সন্ধ্যার তিমিরে
শান্তি নামে পাহাড়ে পাহাড়ে।
তারই অনুবাদে যেন পৃথিবীর ও প্রান্তেও নেমে পড়ে ঘুম।
শুধু জ্বলে বনের আগুন এক অন্ধকার মসৃণ শরীর—
শিকারী চিতার স্তব্ধ চোখের গভীর
পত্র-ঝরা রাত্রির ফাল্গুন॥

পটভূমি

পীত গবাক্ষে সর্পিল বেণী দোলে।
ঘন শৃঙ্গারে পথচারী মন ভোলে।
যায় যাক ডুবে গম্ভীর রণরোলে
মেদিনী। ক্ষণিক ভোলালে ও পটভূমি।

আর নয় দেরি, সাবধানী, চোখ বোঁজো।
কানে ঠাসো তুলো, পাতালে বিরাম খোঁজো।
আকাশ পৃথ্বী টলোমলো। চুলে গোঁজো
রক্তিম জবা। তান্ত্রিক পটভূমি।

টিনের চালাতে চড়ুই-এরা শুনি নাচে।
আত্মা আমার কি অমৃত খেয়ে বাঁচে।
ভাবি আর দেখি, করুণ বাংলা পাঁচে
প্রতিবেশিনীর মুখ। হীন পটভূমি।

মেঘের তুলোর সুতো কেটে কেটে কারা
নীল শাড়ি বোনে স্বচ্ছ, সীমানাহারা।
খবর পেয়েছি ট্রেঞ্চে গিয়েছে যারা
বন্ধু আমার। নিষ্ঠুর পটভূমি।

পথে যেতে দেখি কঙ্কালসার গাছে
কালো কালো ফুল,—কাকগুলো বসে আছে।

পীতপ্রায় মাঠে বসেছে বুড়ির কাছে
শীর্ণ বৃদ্ধ। জরিষ্ণু পটভূমি॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

(১৯১০)

মেঘ-নগর

বৃথাই হায় জীবন যায় দিন গুনে
ওঠে না তা'র আঁচলে আর রামধনু,
ফোটেনা প্রেম-কাননে শ্বেতমল্লিকা
বিরহলীন কাটে না রাত কবিতাতে

অঙ্গে তা'র নেই চাঁপার স্বর্ণাভা,
উষ্ণ সুখ রেশমীলাল ওষ্ঠেতে;
রুদ্ধমন কাব্যে আর ছন্দ নেই
শান্তি নেই ব্যর্থ এই জন্মেতে।

বিফলে মোর দেহের বল ঘুচিয়েছি
আশার প্রেত তবুও দেয় হাতছানি,
আকাশে তাই মঙ্গলের লাল দেহ
রাতে জ্বালায় ভাগ্যে মোর লালবাতি।

এখন তার রক্তহীন শবদেহ
করাল মারীগুটিকাক্ষতে কুৎসিতা,
চিনবে না মোর বাসবদত্তারে,
ভ্রমরহীন শুকনো ফুল নেই মধু,

একদা নীল আকাশে হায় যা'র তরে
তারুণ্যের পক্ষিরাজ উড়িয়েছি
আজিকে তার শূন্যে নীল মেঘনগর,
জীর্ণ তার স্বর্ণকেশ রুক্ষতায় ॥

আমরা ভুলিনি

জীবনকে ভালবাসতে বাসতে যারা শেষ হয়ে গেল
তাদের কণ্ঠস্বর ডালিমগাছের হাওয়ায় কাঁপে,
রূপনারায়ণের সোনালী বালুচরে
স্তরে স্তরে নিস্তব্ধ ঢেউ তোলে !
আমাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে
এইসব একরোখা প্রেমিকরা
শাশ্বত !
এদের প্রত্যেকের রক্তচন্দন মাখা আত্মা
মৃগনাভির সুরভিমদির মন
বুক-ভরা সংকল্পের
কিংশুকবর্ণ ছায়া-শরীর
আমাদের আগামীকালের মহাপরিধির মধ্যে
থমথম করে ।

ঈশানী মেঘের বুকে আঁকা এদের নিশ্বাসের ছবি
বজ্র-বিদ্যুতের মিছিলে
ঝড়ের ক্লান্তিহীনতায়
আমাদের প্রেমকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে
নতুন ক'রে ক্রমাগত জন্মাতে থাকে ।
সমস্ত স্বর্গীয় আজগুবি কামনাগুলোকে আমরা
গলা টিপে কবর দিই ।

যাদের উচ্চাশার হাজার হাজার ধ্রুবতারা
মাঝপথে নিবে গেছে
তারা আমাদের ভালবাসার রাত্রিতে
ভীড় ক'রে আসে।

মৃত্যুরূপী ঘুমের টুকরো টুকরো শরীরগুলো মাড়িয়ে
রক্তমাখা অনেক বাঁকা-চোরা পথ পেরিয়ে
সূর্য ওঠার আগেই
ওরা আমাদের প্রেমকে ঘিরে ফেলে।
ওরা বলে :
'অনুরাগকে যদি নিরুপদ্রব শান্তিতে ভোগ করতে চাও—
আমাদের কথা ভুলো না।'

আমরা ভুলিনি।
চিরকালকে খণ্ডকালের মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে
আমরা এগিয়ে চলি
ওদের অসমাপ্ত ভালবাসার কথা মনে রেখে,
ওদের রক্তে ধোয়া স্বাধীনতার মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে

কোকিল

পুরোনো ফাগুনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
জানি না কা'কে,
মনে পড়ে যায় দুপুর বেলায়
যেই ফাঁক পাই কাজের ঠেলায়
দক্ষিণ পথে উষ্ণ-উদাস বাতাস বয়
আকাশময়।

কবে যে কখন বয়স বেড়েছে
কত সঙ্গীরা সঙ্গ ছেড়েছে

নতুনেরা কত এসেছে
সকাল-সন্ধ্যা দুই দিগন্ত রঙের প্লাবনে ভেসেছে।

আজো ফাল্গুনে বসন্ত আসে মূর্ছনা কাঁপে পঞ্চমে
নানা অকারণ চিন্তায় মন থম্‌থমে,
সূর্যের পানে চেয়ে থাকে রাঙা পলাশবন
উদাসমন,
ক্লান্ত জীবনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
জানি না কা'কে
মনে পড়ে যায় বড় অবেলায়
নানা ঝঞ্ঝাটে বসন্ত যায়
বনপথে শুনি চিরদিনকার কোকিল ডাকে
কাজের ফাঁকে !!

এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে !

নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস।

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,

শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা !

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি
একফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে,
চৈতালী সূর্যের থম্‌থমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা ॥

একফালি আকাশের কোলঘেঁষা কার্নিস,
রঙচটা গম্বুজ দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘেরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা।

রুপালী পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর !
হে কপোত, পারাবত, পায়রা,
যে দিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দূর
রুপালী পাখায় আঁকা শূন্য।

আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি,
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা ॥

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৯১৪)

পঞ্চতপা

দিবাভাগে কর্মকাণ্ড আরম্ভিল যেই
ত্রস্তপদে নতমুখে বসি' কেদারাতে
আফিসের খাতাপত্রে যোগবিয়োগেই
মুনাফা বরাদ্দ করি। স্বর্ণগদি যাতে
কুবেরের লম্বোদরে নিত্য শোভা পায়
সকালে উঠিয়া রোজ রোজারি যে করি—
রেখো মা দাসেরে হেন শ্বেতাঙ্গ প্রচ্ছায়
সন্তানসন্ততি সহ চিরকাল ধরি'।

কবে যে বিগত ঋষি বঙ্কিমের কাল :
বর্ণিত আনন্দমঠে ইঙ্গ জয়গান।
যদিও বেকার তবু বেপরোয়া চাল,
অহিংসায় ব্রতী। গান্ধীনামে মূর্ছা যান
বীরবৃন্দ যত। বুঝি এই সোজাসুজি
চোর গোলামেই আজো অবতার খুঁজি॥

এআরোপ্লেন

ঘন নীল নভে দেখেছি বিহার তব।
প্রভাতকিরণে শ্বেত সুন্দর দেহ।
খর নির্ঘোষে কি যে আছে কিবা কব।
মুগ্ধ চোখেতে তাকায় যে হোক কেহ।

ভুল ক'রে যদি বলে কেউ তব গতি
যেন পক্ষীর, যেন মৎস্যের মতো,

বৃথা তর্কে কি বলব তাহার প্রতি
যন্ত্রের গতি তার চেয়ে আরো কত ?

বরং সূক্ষ্ম মাতরিশ্বার সাথে
তুলনা তোমার দেওয়া যে তবুও চলে।
পাতলা হাওয়ার ঢেউ কেটে চল প্রাতে।
অসীম ক্ষমতা জেনেছি তোমার কলে।

অথচ তেমন শক্ত নওকো তুমি।
হঠাৎ যে কেউ ছুঁড়লে একটি গুলি
উড্ডীন পাখা পাখসাটে নেবে ভূমি—
থেমে যাবে হৃদ্‌যন্ত্রের মোটা পুলি।

আজ অবশ্য তোমার ভয়েতে সারা।
পৃথিবীসুদ্ধ তোমার শক্র যেন।
বৈশ্বানরের তাণ্ডবে গৃহহারা—
(তার চেয়ে ভাল শ্মশানে বসতি শ্যেনও)।

আমি কিন্তু এ যুক্তিতে না দি' কান
না শুনি ভয়ের করুণ আর্তনাদ।
পৃথিবীও যদি হয়ে যায় খান খান,
তব সম্মানে থাকব অপ্রমাদ।

ভুলে যায় তারা নেই কো তোমার দোষ।
অন্যায়ভাবে ব্যবহার কেউ ক'রে
মুছে ফেলে যদি মানুষের সন্তোষ—
সবটা দোষ কি চাপাবো তোমার 'পরে ?

তুমি তো সত্যি মানুষের মতো নও
যে, বিবেক বিবেচনায় চলবে কত।

আকাশ-পারের কাণ্ডারী তুমি হও।
খেয়া পারাপার করে যাও অবিরত।

সেখানে তোমার অবাধ সঞ্চরণ
বুদ্ধিবিহীন জড়যন্ত্রেরই কাজ।
অথচ দেখেছি চেতনার লক্ষণ ;
জড় জগতেই উদ্ভব তার সাজ।

আমি তো কতই বারে বারে বলি ভাই
তোমার বহুল প্রচার হোক না দেশে।
কর্ম জীবনে কত সাহায্য চাই।
কত না খবর দেবে জানি তুমি এসে।

আমরা তো জান চাই পৃথিবীর দেশ
হোক্ একাকার হৃদয়ে হৃদয় মিলে।
সে কাজেতে জানি পাবে না কখনো ক্লেশ
শান্তি অথবা বিপ্লবে ভার নিলে॥

ওডিসিউস

অপরাহ্ণে পত্রগুচ্ছ মর্মরে কেবল।
অথবা আমার স্বপ্ন ? শুনি কণ্ঠের কল্লোল
শিঞ্জীর মূর্ছনা, নৃত্যরতা বনদেবীদের।
অধোমুখ আকাশের
কবোষ্ণ কাঞ্চন-প্রভা নীলারুণ স্রোতে
সোনায় সোহাগা যেন। বাঁচি কোন মতে
এ হেন যাত্রায়। ক্ষুরধার বালি
দিয়েছে আশ্রয় তবু। বিপুল আস্ফালি'
তরঙ্গ-নিচয় মোরে করেছে নিক্ষেপ

দূর হতে দূরে ; বুঝি শেষ অবলেপ
আনগ্ন শরীরে দেখে লবণাক্ত বালুকাবেলায়।
আহা, সেই সমুদ্র-যাত্রায়
ধরেছি কেবল
সযত্নে গলুই . তরঙ্গের দল
সান্তর বিভঙ্গে অবিরাম করেছে গর্জন ।
এসেছি যখন
সর্বনাশা মুখোমুখি পাহাড়ের কাছে,
থমকে আমার তরী—ভাবি বুঝি আর না সে বাঁচে
হিমতুর্ কঠিন !
অঙ্গে যেন হয় অঙ্গহীন ।
শোনেনি এ আর্তের ক্রন্দন
আতপ্ত চুল্লীর পাশে পৃথ্বীর নন্দন ।
চিত্তের গুমোটে শুনি কভু ঝাঁকে ঝাঁকে
সাগর-বলাকা খালি ডাকে ।
তারি ডাক একমাত্র হাসিই আমার ।
দেখি বসে পার হয়ে তরঙ্গ-প্রাকার
স্নানের আনন্দে তারা দলে দলে মেলে শত পাখা
সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে যায় পরস্পর বাঁধে যেথা শাখা
অপ্রমেয় বৃষ্টি ও তুষার ।

অসহ্য ঠেকে না আর
দৈবের লিখন ।
তাছাড়া এবারে বুঝি হয়েছে প্রাক্তন
সমুদ্রের ক্রোধ যত ।
তবু কত
এসেছে সংশয়
পরম বিস্ময়
এই কণ্ঠস্বর ।
জানি না এ দৈব কিংবা নর ।

পদধ্বনি করে হতবাক—
মনে হয় সাটিরের আশ্চর্য দুলাক।
অদূরে নদীর তীরে
কৃশকায় বেণুবন ঘিরে
অপরাহ্ণে মুহুর্মুহু বংশী অনুনাদে
পলাতক বনদেবী বিড়ম্বিত প্যানের প্রমাদে।
—বৃক্ষের আড়ালে তবে নিজেরে লুকাই।
বনের লতাই
আনগ্ন শরীর ঢাকে।
লতাগুল্ম ফাঁকে
দেখেছি নিশ্চয়—
ফেনিল রূপশ্রী ঝরে সারা অঙ্গময়
কন্দুক-ক্রীড়ায়।
বৃত্তাকারে পদক্ষেপ পায়
নৃত্যের ভঙ্গিমা।
অরুণিমা
কুমারী-যূথের ভালে কপোলে অধীর।
এলায়িত কেশ কবরীর
হীরক ছটায়
গতীয় আবেগে কভু কাছে এসে দূরেতে পালায়।
সবুজ প্রান্তর দেখ অপরাহ্ণে সোনায় উচ্ছল।
তরঙ্গ-বহ্নিরে ধরে কৃষ্ণচূড়া, কিংশুকের দল।
তাদেরি উত্তাপে যেন পর্বতের সানুদেশে ফাটে
আতাম্র ডালিম। রাগরক্ত ঠোটে
যেমন মৌমাছি আসে তৃষ্ণায় কাতর
কভু রক্তে সেইমত ঘটে রূপান্তর
ক্ষণিক আশ্লেষে—
স্বপ্ন, মতিভ্রম শেষে।
বারে বারে ঠেকে গিয়ে এসেছে নির্ভয়,
একনিষ্ঠ স্বধর্মে প্রত্যয়।

যাইনি তলিয়ে
এমন কি নরকেও গিয়ে।
শোণিত উৎসর্গে সেথা নিরুপাধি প্রেতচ্ছবি ঘিরে
খুঁজেছি কেবলি মোর পথ-সন্ধানীরে।
(এমনি গৃহের টান প্রবাসীর কাছে।)
জানি এ জঙ্গম স্থল মুহূর্তেই রঙ্গিলা কি ছাঁচে
তারপর সকলি মিলায়
নিরাকার অন্ধকারে আশ্রয় সহায়।
লুকাতে পারি না তাই আর,
আশা দুর্নিবার।
কুমারীর দলে ভিড়ি অধোমুখে বিষম লজ্জায়।
সভয় চিৎকারে তারা অমনি পালায়
নিষাদের শিলীমুখে মৃগেরা যেমন।
সহসা তখন
নিরাশ্রয় চোখে ভাসে করুণা অপার
শুভ্রবাহু নোসিকা আমার॥

দিনেশ দাস
(১৯১৫)

ভারতবর্ষ

চোখভরা জল আর বুকভরা অভিমান নিয়ে
কোলের ছেলের মত তোমার কোলেই
ঘুরে-ফিরে আসি বারবার,
হে ভারত, জননী আমার!

তোমার উৎসুক ডালে
কখন ফুটেছি কচি পাতার আড়ালে,
আমার কস্তুরি-রেণু উড়ে গেছে কত পথে
দিগন্তে আকাশে ছায়াপথে,
তবুও আমার ছায়া পড়েছে তোমার বুকে কত শত ছলে .
তুমি বাঁকা ঝির্‌ঝিরে নদী ছল্‌ছলে
বাজাও স্নেহের ঝুমঝুমি,
জননী জন্মভূমি তুমি !

তোমার আকাশে আমি প্রথম ভোরের
পেয়েছি আলোর সাড়া,
দপদপে হীরে-শুকতারা
অস্ফুট কাকলি
জলে ফোটে হীরকের কলি
মধ্যাহ্নে হীরের রোদ
হে ভারত, হীরক-ভারত !

কোন্ এক ঢেউ-ছোঁয়া দিনে
বঙ্গোপসাগর থেকে পথ চিনে চিনে
কখন এসেছি আমি ঝিনুকের মত,
তোমার ঘাসের হ্রদে ঝিলের সবুজে
খেলা করি একা অবিরত।

আমি তো রেখেছি মুখ
তোমার গঙ্গোত্রী-স্তনে অধীর উন্মুখ,
মিটাল আগ্নেয় ক্ষুধা তোমার অক্ষয়বটফলে
দিনান্তে সুডৌল জানু মালাবার করোমণ্ডলে
দিয়েছ আমাকে কোল,
কত জলতরঙ্গের রাত্রি উতরোল
ভরে দিলে ঘুমের কাজলে,

মিশে গেছি শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে
তোমার মাটির নাড়ি হাওয়া আর জলে
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত শরৎ—
হে ভারত, হীরক ভারত !

আজ গৌরীশঙ্করের শিখরে শিখরে
জমে কালো মেঘ,
বৈশাখী পাখির ডানা ছড়ায় উদ্বেগ :
তবু এই আকাশ-সমুদ্র থেকে কাল
লাফ দেবে একমুঠো হীরের সকাল
চকচকে মাছের মতন—
হে ভারত, হীরক-ভারত পুরাতন !

দোলনা

আজকে ছোট দোল্‌নাখানি ঝুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মন-ভুলানো
নিংড়ে আনো
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোল্‌নাখানি দুলিয়ে দাও।

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেব্‌তো-শিশু ককিয়ে মরে

অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তূপীকৃত।

আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির দোল্‌নাখানি দুলিয়ে দাও॥

ছায়াপাহাড়

স্তব্ধ ভূগোল। কলকারখানা ক্ষেতখামার।
কলের পাথরে লাঙলের ফালে গুঁড়ানো হাড়।
মাঝখানে শুধু শিং উঁচু ক'রে রাত্রিদিন
দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়
সীমানাহীন।

জীবন জলের কল্লোল ওঠে কলস্বরে,
হৃদ্‌পিণ্ডের ঝুপঝুপে দাঁড় এখনো পড়ে
ছলাৎ ছল,
প্রদীপের ভিজে শিখার মতই হৃদয় ঝরে
অচঞ্চল,
দুর্নিবার।
মাঝখানে শুধু ছায়াপাহাড়।

রাত-নিশীথ
বালুঝড় ওড়ে। ঢেউ ভাঙেচোরে। পুরানো ভিত
টলমল করে, লোনাজল ঢোকে নতুন খাতে,
ভিতের শিকড় কুরে-কুরে খায় ফেনার দাঁতে

তবু অসাড়
মাঝখানে ফাঁপা ছায়াপাহাড়।

ছায়াপথের কালো ছায়া পড়ে অহর্নিশ
ঢাকে দূর-মাঠ দূরান্তের,
তারই নীচে আজো গম পাকে, জাগে ধানের শিষ
হেমন্তের :
হৃদয় এখনো পাখা ঝাপ্‌টোয় জীবন এখনো মানেনি হার—
ধোঁয়ার মতই ফুলে ওঠে শুধু দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়

সুশীল রায়

(১৯১৫)

বয়স

"শুনি-না বয়স কত!" কৌতূহল নিয়ে দুই চোখে
অকস্মাৎ অর্বাচীন প্রশ্ন করি—"জন্ম কোন্ শকে?"
বঙ্গাব্দ খ্রীস্টাব্দ কিংবা নব অব্দ, সেসব প্রশ্ন না—
তিন-শ-পঁয়ষট্টি দিন কতবার করেছে গণনা,

কতবার পরিক্রমা করেছে পৃথিবী সূর্যটিকে
তার জন্মদিন থেকে। সে-খবর অবশ্যই লিখে
রেখেছে ঠিকুজি, কিন্তু সে-খবর খুঁজি তার চোখে,
অকস্মাৎ অর্বাচীন প্রশ্ন তাই—"জন্ম কোন্ শকে।"

অদ্য পুনরায় ওই চোখে দেখে জ্বলন্ত আগুন
ভুল হয়ে যায় বিংশ শতকের নিয়মকানুন,

ভেঙে যায় সৌজন্যের বাঁধ, জেগে ওঠে দুঃসাহস,
প্রশ্ন করে বসি তাই—কবে জন্ম কত-বা বয়স।

শিহরিত হয়ে ওঠে সর্ব অঙ্গ তার, সে-শিহরে
রোমাঞ্চিত এ-শরীর চতুর্গুণ রোমাঞ্চিত করে।
দু চোখে বিস্ময়চিহ্ন এঁকে নিয়ে বলে, "বলো, কেন,
হঠাৎ এ প্রশ্ন আজ, কৌতূহল হঠাৎ এ-হেন!"

এ কেনর কি উত্তর দেব ভেবে বলি, "থাক্ থাক্,
জীবনে জ্বেলেছ বহ্নি, সে-আগুনে পুড়ে হই খাক,
সেই ভালো। ইচ্ছে ছিল, জেনে নেব প্রণয়ের লীলা
কোথা থেকে পেলে কবে ; সেই হেতু, যদিও মহিলা,
তার কাছে পুরুষের অশোভন এই প্রশ্ন। যেন
ভুলেও বুঝো না ভুল, জিজ্ঞাসা কোরো না আর—কেন।"

দুইটি সলজ্জ চোখে অপলক চেয়ে থাকে স্থির,
ধীরে নত করে দৃষ্টি, অবশেষে বলে, "এ-শরীর
কবে এল পৃথিবীতে, সে অঙ্ক তো সামান্য গণিত।
যে-সংবাদ চাও তুমি তার কথা অতি বিপরীত।
কবে জন্ম কোন্ শকে, খুঁজে পাব কোথায় তারিখ—
ইতিহাসে নাই লেখা, সে-ঘটনা প্রাগৈতিহাসিক॥"

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯১৬)

অলিখিত

কলম যেখানে থামে, সে-বিরলে মনের আকাশ ;
ছুটি পায় সে আকাশে হৃদয়ের অনুভূতিগুলো—
আমায় সেখানে রাখো হে অন্তর, হে বচনাতীত,

সেখানে সার্থক আমি প্রিয় সেই আমার আবাস ;
সেখানে রঞ্জিত হবো দূরে ফেলে ধরণীর ধুলো,
আবর্জনা একরাশ, ঝরাপাতা পরিপাণ্ডু, পীত।

হৃদয়ের সেই লক্ষ্য, লেখ্য থেকে আলেখ্যের দিকে—
সেখানে আমার যাত্রা কথার অতীত কোনো তীরে
সুষুপ্ত যেখানে দেহ, অনুভূতি শুধু জেগে ওঠে—

সেইখানে স্থান দাও, আর দিও ছুটি পাখা মোটে
মাত্রাহীন কল্পনার, দেখো আমি আসবো না ফিরে,
ঠেলবো না এ কলম, কালে যার কালি হবে ফিকে ॥

ইতিহাস

তোমরা দেখেছো সেই সুবিখ্যাত কালা বুড়োটাকে ?
একেবারে ঢাক-কালা ; গোরস্থান কিংবা যত শ্মশানে সে থাকে।
থাকবার মধ্যে তার দুনিয়ায় পুঁজিপাটা আছে এক খাতা—
তাতেই সে লিখে রাখে প্রতিদিন যত গত স্মৃতিবদ্ধ মৃতের বারতা।
নাকে পুরু পরকলা ; কাছাকাছি দৃষ্টি নেই, বয়োগুণে দূরে চলে গেছে—
চুল ভুরু শাদা সব, চর্ম লোল জরদ্গব তবু আজো দিব্যি আছে বেঁচে।
জ্ঞানী ব'লে জনশ্রুতি আছে বটে, লোকে তাই নানা প্রশ্ন করে তাকে এসে ;
সে কিন্তু শোনে না কিছু—ব'কে যায় সে যা জানে শূন্যে চেয়ে উদাসীন হেসে।
মিলিয়ে মিলিয়ে দেখো কী তোমার প্রশ্ন আর সে যা দিলো অদ্ভুত উত্তর—
দুয়েতে সম্পর্ক কিছু মেলা ভার বরঞ্চ দেখবে স্পষ্ট ব্যবধি দুস্তর।
কিছু শুনবে না বুড়ো, ব'কে যাবে যা জানে সে আপনমনেই—
এটুকু অভ্রান্ত জেনো তোমার প্রশ্নের তাতে লেশমাত্র সদুত্তর নেই।
কতই মরবে রাজা উজীর আর জড়ো হবে অনন্ত নজির—
সংবাদের স্তূপ আর রাশীভূত তারিখের ভিড়—
কেউ যদি তাকে গিয়ে প্রশ্ন করো—কী তোমার নাম ?
সে শুধু আওড়াবে—শোনো দুর্দান্ত 'নাদির শা'-র এই পরিণাম।

গলাটা ফাটিয়ে যদি চিৎকার ক'রে ওঠো—বিশ্ববাসী, চেনো কেউ একে ?
'ওরি নাম ইতিহাস—শাশ্বত বধির বৃদ্ধ !'……ত্রিকাল উত্তর দেবে
প্রাণপণে হেঁকে ॥

সমর সেন

(১৯১৬)

স্মৃতি

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
পার হয়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
শ্রান্ত হয়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে ॥

নাগরিক

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি

আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,

হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি।
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে ;
পাটের কলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে ধূসর পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এলো নদীর উপরে,
চারিদিকে অন্ধকার—রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোন দ্বীপ থেকে,—

সেখানে নীল জল, ফেনায় ধূসর-সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের 'পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

যতদূর চাই হাসির অরণ্য,—
পায়ে-চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী !
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে

জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন

আর কত লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!
যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
—স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলো :
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গনোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
সন্ধ্যার সময়,
রাস্তার অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি—
চারিদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ ॥

জাতীয় সংকট

ছানিপড়া চোখে
অন্ধকারে নীল বিদ্যুৎ চমকায়।
শূন্য পেট ইতস্তত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ
চড়কের যন্ত্রণায় সান্ত্বনা চায়।
হয়ত হাওয়া বন্ধ ; এ প্রান্তরের দিগ্বিদিকে
স্তূপীকৃত স্তম্ভিত বালুর উত্তাপে
আবহাওয়া লাল হয়, মধ্যদিনে সূর্য, মনে হয়
এক অতিকায় তৃষ্ণার্ত মহিষের চোখ
শূন্য থেকে একমনে জলাশয় খোঁজে,
ব্যর্থ নিঃশ্বাসে হাওয়ারা হঠাৎ দল বেঁধে চলে,
ছিন্নপত্রে, বালুতে, পাথরে অনর্থক হিজিবিজি কেটে।
এ প্রান্তর আমাদের উত্তরাধিকার।

২

পথে আজ লোক নেই, জবাবী হাম্‌লা হল শুরু !
কারাগার অবারিতদ্বার, গ্রামে গ্রামে বিপর্যয় ;
রাস্তায় নিরস্ত্র লোক হৃৎপিণ্ডে আহত, সন্ধ্যা রক্তক্ষরা।
মাঝে মাঝে বিচলিত অন্ধকারে প্রহরীর ডাক
রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে।
দিগন্তে নিভেছে চাঁদ, অন্ধকার ভেঙেছে বাঁধ,
স্তরে স্তরে সমুদ্যত বজ্রপেশী মেঘ,
বর্বর ঝঞ্ঝাবাহিনী !
দিকে দিকে কালো শিবির, শেষ খোঁয়াড়ে কারা
সারি সারি জমে,
জ্বালায় আগুন, অস্ত্রের কী বা বাহার ! সাম্রাজ্যের পতাকা
ওড়ায় দাপটে।
আজ ছত্রভঙ্গ জনতা, ধীরে ধীরে রুদ্ধ করে অরাজক ক্রোধ,
বোঝে, সংহত পাথ্‌সাটে চূর্ণ হবে শতাব্দীর আপদ।

ক্রান্তিতে মরীয়া প্রভু মদগর্বে ভোলে বারবার,
বুদ্ধিভ্রংশ তারি ঘটে, সর্বনাশ ভবিতব্য যার।

৩

রাস্তায় রক্তের দাগে
মৃতেরা স্মরণ মাগে।
শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশায়
ট্যাকসই সংসার ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায়,
শবলোভী শকুনেরা স্তব্ধতায় উড়ে যায়।
বাজারে দারুণ ভিড়; দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছাপ
অনেকের মুখে।
ভারতের হৃৎপিণ্ডে হানা দেয় বিদেশী বণিক
পূর্ব সীমান্তে ক্রমশ জমে পীত সৈনিক।

৪

জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।

আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, চালচুলো বজায়ের চেষ্টা তাই আছে
কিছু গুণ হয়ত একদা ছিল, এখন ঘুণের পালা।
এ বাঁজা বছরে এক একটি দিন শেষ হয় সন্ধ্যার আড্ডায়,
ঘরে ফিরে গম-বাজরার রুটি, কিছু পরচর্চা,
ঘুমের আগে ইতস্তত চিন্তা, অস্বস্তি;
বাইরের রাত্রি হয়ত নিটোল নিবিড়,
আধো-ঘুমে আধো-স্বপ্নে আমার রাত্রি কাটে,
অধিকাংশই উৎকণ্ঠার স্বপ্ন।

*　　*　　*　　*

পুরোনো বন্ধুরা ইতস্তত উধাও,
যৌবনের আকর্ষণ যত ক্রমশ কমে এলো,

প্রাত্যহিক জীবনের কুম্ভকর্ণ ঘুমে
কে শোনাবে সখি শ্যামের বাঁশি!
শরীরের প্রাকৃতিক আবেগ,
তপ্ত মুহূর্তের খড়্গ! আনে না অলীক স্বর্গ
মদির গোধূলিতে।
মজলিসের মদিরা বিস্বাদ! গুমোট আর্তনাদ শুনি
মহাশূন্যে ঘনিষ্ঠ মেঘে; উদ্দাম বেগে
সকালের আকাশে আগত শিকারী জাহাজ,
হাজার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ!
চোখ ঝলসায় ইস্পাতের ঈগল,
পরক্ষণে আর্তনাদ, মর্মভেদী কলরোল!
বহুপাপে সিদ্ধ এক মোক্ষহীন বৃদ্ধ
দন্তহীন কান্নায় বিলোল মাড়িতে
মৃত যৌবনের পাশে আগত চকিতে,—
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র!

* * * *

গোধূলির পরে
পুরোনো গ্রামের পরিচিত দোকানে আসি,
টিম্‌টিমে আলো, দেয়ালে দেয়ালে করুণ ছায়া,
শূন্য চালের থলি, শীর্ণ ইঁদুর।
অন্দরে যাবো না।
শুনেছি বৃন্দাবন পরলোকগত, পীত বোমায় পরলোকগত,
এ দোকান তারি ছিল।
হাওয়া দেয় ঝলকে ঝলকে,
আকাশে আষাঢ়,
পঙ্গপাল রোগ পুঞ্জীভূত মেঠো পথে,
মাঝে মাঝে মহাশূন্য ডানা ঝাড়ে শকুনের মত
মধ্যরাত্রে যখন তীব্র বাঁশি বাজে।
মনে পড়ে, কাছের শহরে অগণন লোক,
চালের কাঙাল!

আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ
কিম্ভূতকিমাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতায়
অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে ব'সে।

৫

তোমার বিষাণ বজ্রে বাজে!
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে,
কৃষ্ণবর্ণ, লোলজিহ্বা, করালবদন।
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা।
ঘূর্ণি-ঝড়ে, বন্যায়, বিস্ফোরকে জয়বাদ্য বাজে।

তোমার দুর্দান্ত আমলে
নরহন্তা বিদেশী রাজ, রক্তজোঁক স্বদেশী বণিক, সর্পিল পঞ্চমবাহিনী
জীবন সংকীর্ণ করে; শহরে, বন্দরে, গ্রামে
প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো।
যাত্রা তোমার কবে শুরু, কোথায় শেষ?
মধ্যনেত্র খরসূর্যের তলে
অন্তহীন বালুতে
কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ সারি সারি উট
আদিগন্ত চলে।

৬

অন্ধ বধির খঞ্জের দলে ভিড়ি,
যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার,
পেশাদার নেতা, রুশভক্ত শৌখিন কবি, চিন্তিত কেরানী,
কিংবা স্বাধিকারপ্রমত্ত স্বামী
বোমারু আকাশের তলে মূষিক বিবরে
ঈগল আকাশের নিচে মূষিক পৃথিবীতে

দ্বিখণ্ডিত-সত্তা জীবনের উদ্বিগ্ন ক্লান্তিতে
হাশিশ্ খোঁজে দ্বিধান্বিত নানা ভ্রান্তিতে।

৭

মধ্যদিনে গান বন্ধ করে পাখি।
কারখানায় সংঘবদ্ধ জমে অনেকের ভিড়,
হাতে বিপ্লবের রাখী!
পোড়ামাটিতে অস্ত্র হাতে প্রহরী জাগে ক্ষুধিত কিষাণ।
ভয়াবহ রণক্ষেত্রে লাল সৈন্য ঢালে প্রাণের আবির।
সহসা মধ্যদিনে বাজে কালের বিষাণ।

অগ্রচারী জনতা নই,
তোমার বিশ্বরূপে তাই দেখি ধ্বংসের প্রতীক!
অজ্ঞের দম্ভ চূর্ণ কর, ইতিহাসপতি!
বিপ্লবী চেতনার সেতুতে
সংকীর্ণ কর এ দুস্তর ব্যবধান,
তোমার অখণ্ড সত্তায় দাও অধিকার,
এ প্রার্থনা আমার।

সীমান্তের অরণ্যে রাক্ষসের মুখে শুনি রামনাম,
পিছনে তার প্রচ্ছন্ন কামান।
নদীতে ডেকেছে বান, পাখিরা গায় না গান,
একে একে লুপ্ত দেশ নারকীয় অন্ধকারে,
তবুও আলোর চুম্বকস্তম্ভ এদিক ওদিকে বাড়ে,
ভুলে ভ্রান্তিতে, উৎকণ্ঠায় নতুন জীবনের ছাপ
আমাদের চেতনায় পড়ে॥

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(১৯১৭)

চন্দ্র-করোটি

সায়াহ্নের স্তব্ধতায় আমি রিক্ত, উদ্দাম তবুও
মনে-মনে কথা বলি ব্যর্থতার গৌরবের গান
অশরীরী ছায়া যত ভীড় ক'রে জানায় কামনা
কৈশোরের স্মৃতি নিয়ে ভারগ্রস্ত। ভয় অপমান
কতবার কৃষ্ণ ক্ষত সর্ব অঙ্গে এঁকে দিয়ে গেছে
বিষাক্ত ক্লেদাক্ত ছবি চেতনায় অবচেতনায়—
হে প্রদীপ্ত সূর্য, তুমি সন্ধ্যার স্থবর্ণে উজ্জ্বল
দিনের কবরে তবু শুনি আমি মৃত্যুর আহ্বান।

এখানে ফুটছে ফুল গন্ধে বর্ণে রঙিন আলোতে
উপরে আকাশ আছে নীল স্তব্ধ সমুদ্রের মতো
আমার কামনা দিয়ে আমিই কি রাঙাবো তাদের ?
সন্ধ্যার নদীর তীরে অন্ধকার আসন্ন উদ্যত,
শবভুখ শৃগালেরা অট্টহেসে দূরে চলে গেলো
ক্লান্ত পাখি নেমে এলো, অরণ্যের অন্ধকার নীড়
নিশ্চেতন হিম-রাত অস্থিসার, স্বপ্ন এলোমেলো :
রাত্রির সন্ন্যাসী জাগে, হাতে পাত্র চন্দ্র-করোটির।

তোমাকে চিনেছি আমি। আজ নয়, আগামী কালের,
শতাব্দীর সিঁড়ি ভেঙে ধাপে-ধাপে এসেছো এখানে।
সর্বাঙ্গে সহস্র ক্ষত, রক্তাক্ত স্বেদাক্ত দেহ, মুখে
স্মিত হাসি। সুন্দর নিষ্ঠুর তুমি। জন্ম-মৃত্যুঞ্জয়॥

অর্কেস্ট্রা

বেদনা-বিস্ময়ে আমি চেয়ে দেখি উদাত্ত আঁধার
ভ্রমরের মতো কালো কম্পিত চোখের দীঘি তার।
ও-পাশে অনেকদিন স্বর্বর্ণের আত্মসমর্পণে
ছায়া ফেলে পাখা মেলে উড়ে যায় মনের দর্পণে।
আমি ভাবি, শুধু ভাবি : কালো চোখ তার।

চাঁদকে তুমি জ্বালিয়েছো
স্বপ্নে আগুন লাগিয়েছো।
অনেক রাতে অনেক দিনে
অনেক খুশির আকর্ষণে
আমায় তুমি ভাবিয়েছো।

এক ফালি চাঁদে কী হবে আজকে বল না :
অনেক দেখেছি চিনেছি ও-বাঁকা ছলনা।
একা নিরিবিলি খেয়ালের ছায়াপথে
ঘোরা শেষ করে এসেছি তোমাকে নিতে।
দূরে দেখো ওই নীলার আকাশ, মমতায়
আরো নীল হোলো। নেমে এসো এই জনতায়

তনুতে তনু নয়নে নয়ন মনেতে পঞ্চশর
কাজল দিনের মেঘের হাটে হয়েছো জাতিস্মর।
কাটছে বেলা হলুদ আভায় নীলের চন্দ্রাতপ
জীবন বনের ক্লান্ত পাখার তীব্র মনান্তর।

দিন হলো নিঃশেষ
রাত হোলো নিঃঝুম
মন হোলো উন্মন
প্রেম আর—আর ঘুম ॥

আমরা

আমরা অনেক হীরা-জ্বলা নীল ক্ষেতে
রাতের শিশিরে প্রজাপতি ডানা পেতে
মিশেছি, হেসেছি, পেয়েছিও ভালোবাসা—
শিকারী শকুন উড়ে-উড়ে আসে : এক চোখে জিজ্ঞাসা।

সেই হীরা-জ্বলা রাতের নীলাভ ক্ষেত
পড়ে আছে দেখি : ধান কেটে নিয়ে পালায় একটি প্রেত।
দুই চোখে তার নরকের আলো, ঠোঁটে লালসার হাসি—
আমরা চিনেছি, মিশেছি, পেয়েছি, চলেছিও পাশাপাশি।

আমরা চলেছি। দেখেছি আগুন কার চিতা যেন জ্বলে
মায়াবী নদীটি বেঁকে চলে যায় আকাশের কালো কোলে।
ফাল্গুন মাসে বাতাসে বাতাসে বনভূমি শিরশিরে
কুমকুম ঢেলে পুরানো এ-চাঁদ আবার এসেছে ফিরে।

আমাদের মন হীরা-জ্বলা ক্ষেত। আমরা জেনেছি তাকে
ছিন্ন করেছি বহু শতকের মেকি আবরণটিকে।
শিশিরে স্নিগ্ধ মাটির স্পর্শ ছেয়েছে পুরানো দেহ
আগামী দিনের গানের কলিতে ঘনীভূত নীল মোহ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

(১৯১৭)

পাখিরা

টিয়া

আশ্চর্য সবুজে লগ্ন রাঙা ঠোঁট যেন বাঘনখ
চোখে চির-জরদ্গব হাকিমের সুশান্ত প্রত্যয়।
কণ্ঠের কর্কশ কীর্তি মনিবের সাহচর্যগুণে
হলো শব্দ, হলো বাক্য, গুরু-লঘু নানা অর্থময়।
আশ্রিত স্বজন যেন বাস করো দয়ার্দ্র খাঁচায়,
প্রাত্যহিক মুষ্টিভিক্ষা সুশাসনে তোমাকে বাঁচায়।
সুব্যক্ত ব্যঙ্গের রক্ত বাঘনখ অবুঝ সবুজে।
মদমত্ত প্রসাধনে, দানাপানি খাও চক্ষু বুজে।

বক

দুনিয়াকে সুপ্রভাত! প্রতিদিন প্রত্যূষের জলে
ভাসে বিশ্ব সুনির্মল। ঋজু চঞ্চু প্রবীণ কৌশলে
শ্রমে আর সুনিষ্ঠায় মুহুর্মুহু করে লক্ষ্যভেদ।
অবিচল ধর্ম তুমি—অণুমাত্র ঘটে না নির্বেদ।
ধৈর্যে তুমি একলব্য,—প্রতীক্ষায় ত্রেতার শবরী।
কলিযুগে মর্ত্যে তুমি নিত্য মারো নির্বোধ শফরী।

চাতক

চাতক, মহাপাতক তুমি—কঠোর তাই তেষ্টা।
মর্ত্য-জলে মেটে না সাধ—মেঘে পানের চেষ্টা।
‘ফটিক জল’, ‘ফটিক জল’,—থামে না ঐ চিৎকার।
ভেবেছিলাম নিজের পরে নিজেই দেবে ধিক্কার।

আপনে চিরবিমুখ তুমি, বাচাল এক বিন্দু।
সমন্বয়ে বিরোধী তাই, ছেড়ে তড়াগ-সিন্ধু—
'ফটিক জল' 'ফটিক জল' শূন্যে করো চিৎকার।
ভেবেছিলাম নিজের পরে নিজেই দেবে ধিক্কার!

কাক

কোকিল-চক্রান্তে কাক, কেন তুমি এতো অসহায়—
নক্ষত্রশাসিত শান্ত সুপণ্ডিত জ্যোতিষীর মতো?
চাতুর্য সহজ বৃত্তি,—তবু কোন্ নির্বোধ নেশায়
এখানে অন্যের অণ্ডে নিজবাসে পরিচর্যারত?

অথচ ত্রিকালদর্শী ভুষণ্ডী তো ছিলেন সজ্জিত
তোমারই প্রসিদ্ধ সাজে, হয়ে সর্ব অজ্ঞতাবর্জিত!
চাটুতাবিজিত ঋষি দধীচির কাকাঙ্ক্ষতা গুণে
সুরলোক হয় তুষ্ট মূর্খ মনে স্বপ্নবীজ বুনে।

একটি পাখি

অজানা, অচেনা পাখি কোথা থেকে আসে শিস্ দিতে
সোনালি গাঁদার বনে দেয় ভুলে ঠোঁটের ঠোকর।
চকিতে আকাশে ভাসে মেঘরঙা পাখার ভেলায়
বাগানে নিড়ানি হাতে মালী করে বকর-বকর।
শালিখ-ময়না-ঘুঘু, পাটকিলে শাদা কবুতর—
আসে তো অনেক পাখি কাছাকাছি ঘন বন হতে।
মনোবনে কেউ তারা বাসা বেঁধে যায়নিকো ফেলে।
কেবল একটি পাখি ছায়া ফেলে গেছে ফুরসতে।
পাৎলা মেঘের নিচে শাদাবুক ওড়ে গাঙ্চিল।
টিয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ডানা মুড়ে হঠাৎ খেলায়।
একা ধান খুঁটে খায় চুপি চুপি চতুর তিতির।
বটফলে হরিয়াল ভারি খুশি সকাল বেলায়।

এতো পাখি দিয়ে তবু মেটেনাক চোখের পিয়াস।
এ শুধু গভীর মোহ—খুঁৎখুঁতে মনের স্বভাব!
একটি অলীক পাখি এনেছিল মেঘের কুহক।
সোনালী গাঁদার বনে গেছে ফেলে বাতিল পালক

কানামাছি—আন্তর্জাতিক

হাওয়ায় সন্ধ্যার গন্ধ—এখানটা বৃহৎ বন্দর
জাহাজে আলোর মালা, নিচে জল। রাতের জেটিতে
আমাকে আসতেই হয়। দেখতে হয়। ধরি একে তাকে
চলছে সোনার ব্যাবসা। এ খেলাটা আন্তর্জাতিক।
আমি এ বৃহৎ বৃত্তে—কানামাছি,—সামান্য চেতনা
ভঙ্গুর জীবিকা মাত্র, তাই ঘুরি,—ঈশ্বর জানেন
কেউ ধরা পড়ে, কেউ সৌম্য মুখে বিপদ এড়িয়ে
আবার সমুদ্রে ভেসে চলে যায় নতুন হাওয়াতে।

সোনায় দেদীপ্যমান পৃথিবীর বিশাল বাজারে
দিন যায়, রাত্রি হয়,—রাত বাড়ে,—আমি সেই রাতে
একটি গভীর কী যে খুঁজে খুঁজে চলি এক মনে—
তখনো চলছে খেলা সোনার গোলক ছোঁড়াছুঁড়ি
কোনো সূর্যকরোজ্জ্বল ভিন্ন দেশে অন্যান্য বন্দরে—
এখানে বিরতি মাত্র,—রমণী,—বিস্মৃতি,—কী যে, কী যে,
এ কানামাছিও হয়তো এই বোধ আন্তর্জাতিক॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

(১৯১৮)

নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা

নবরূপে লভিলাম।
শহর-সীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
দূরে নদী ; ঝরায় সন্ধ্যার সূর্য জলে অবিরাম
গোধূলির সোনালি আবির ;
গোরু নিয়ে ঘরে ফেরে
ঘর্মাক্ত কৃষাণ, সন্ধ্যার আকাশে
চাঁদ উঠে আসে,
অশ্বত্থ-বটের তলে ঝিঁঝি পোকা ধরে ঐকতান।
এক ফালি মাঠ ; পুরানো লণ্ঠন হাতে
সমুখের পথ দিয়ে
ছায়ামূর্তি চলে গ্রামবাসী ;
পত্র-ঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ
জোনাকি-যোনির মুখে হাসি।
পুরানো মন্দির জনহীন। জ্বলে না তো সন্ধ্যাবাতি—
অবলুপ্ত স্তবগান, কুমারী-আরতি।

২

কেন ভয়, কেন বিহ্বলতা, কেন এই বেদনা নিগূঢ় ?
মন্থর মুহূর্তগুলি
আপন স্মৃতির ভারে মৌন, তন্দ্রাতুর।
সদম্ভ অঙ্গুলি তুলি'
নির্মম কদমে চলে ক্ষমাহীন কাল

উন্মত্ত ভয়াল
ক্ষিপ্র তার গতিবেগে কর্মের আভাস।
শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস
আকাশে বাতাসে ঘুরে মরে,
মধ্যাহ্নবেলায় সন্ধ্যায় রাতজাগা রজনীর স্বরে
রাত্রি আসে, হাওয়া বয়ে উন্মুক্ত ধারালো—
সমস্ত শরীর লাগে ভালো ;
নির্জন প্রান্তরে হাঁটি, অরণ্যমর্মরে শুনি কার
ক্লান্ত হাহাকার
অনেক বাতাসে আজ হৃদয় পাহাড়।

৩

নবরূপে তবু লভিলাম।
শহর-সীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
হে হৃদয়,
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয়,
সত্তার গভীরে আনো চৈতন্যের মাঙ্গলিক দ্যুতি,
আনো অনুভূতি
আহত ইন্দ্রিয় 'পরে পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা প্রদোষবায়ুর
বিপন্ন স্নায়ুর
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ক্লেদ ; ঘোলাটে আবেগ
শূন্য মনে অশান্ত শরীরে
আসুক সেখানে ফিরে
জঞ্জালকে দূরে ঠেলে সদ্যোজাত দৃপ্ত গতিবেগ।
যাত্রাপথ তলে
মাধবী-বল্লরী মূলে যুগে-যুগে ঢেলেছে আবির
দীপ্ত দুঃখদাহে যাত্রীদল ;
(নিদ্রাহীন বেদনায় আর কেন চঞ্চলতা হে বিজয়ী বীর !)

মনের প্রাঙ্গণে আজ জিজ্ঞাসার লাল সূর্য জ্বলে
এক ফালি মাঠ ; পুরানো লণ্ঠন হাতে
ছায়ামূর্তি চলে গ্রামবাসী,
পত্র-ঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ,
জোনাকি-যোনির মুখে হাসি।

৪

হে হৃদয়,
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয়
আকাশে বিপন্ন চাঁদ নির্জন প্রান্তরে
বাদুড়ের কৃষ্ণ ডানা নড়ে—
কত জন্ম কত জন্মান্তরে
ভাঙা হালে পাড়ি দিতে গিয়ে তবু পেয়েছি অভয়।
অস্তাচলে সূর্য চলে ; নবসূর্য এক
মানুষের বুকে—
দুঃখদৈন্যে রুদ্ধশ্বাস তবু রাত্রি-দিন
উদ্যত সে কালের বাহিনী
চলেছে সমুখে।
ক্ষুদ্রতার তুচ্ছতার ফাঁদ থেকে দিলো মুক্তি আজ
রক্তস্রাবী কল্লোল কালের ;
জীর্ণতার অবশেষে, উঠেছে আওয়াজ
নদীপ্রবাহের, পূর্ণ নতুন প্রাণের ॥

গোপাল ভৌমিক
(১৯১৮)

অবরুদ্ধ নায়ক

সম্মুখে সমুদ্র নেই,
চিন্তার পাহাড়
উদ্যত ও প্রলম্বিত :
ঘাসে ঢাকা সমভূমি।
নুয়ে-পড়া মানসিকতার
পরিচয়বাহী ব'লে
চিন্তা গড়ে বিদ্রোহী প্রাকার।

যতই পাহাড় হই
যত করি আকাশ কামনা,
হৃদয় পায় না খুঁজে
শান্তি কিংবা মধুর সান্ত্বনা।
সে তার ধ্যানের শঙ্খে
বারবার দিয়ে যায় ডাক
সে চায় সমুদ্র, শান্তি,
পাহাড় মাথায় তোলা থাক।

পাহাড়ে সমুদ্রে তবু
কদাচিৎ হয় দেখাশোনা ;
এক হাতে তরবারি
আর হাতে শান্তির সান্ত্বনা
নিয়ে তবু
দূর হতে দূরে পথ চলি,
পথ জুড়ে পড়ে আরাবলি॥

বাণী রায়

(১৯১৯)

রিক্‌শার গান

কঠিন পথেতে কোমল রিক্‌শা চলে।
রাত্রি অনেক!
—টুংটাং করে করুণ রিক্‌শা বলে।
পীচ-ঢালা পথ গলে না এখন রোদে।
এখন অনেক রাত!
পিঠের চামড়া-পোড়ানো রৌদ্র নয়—
তবু বড় অবসাদ,
এখন অনেক রাত।
টুংটাং করে ক্লান্ত রিক্‌শা বলে—
রাত্রি এখন ঝরে
গলানো মোমের নরম ধারানি যেন।
রাত্রির যত পরাগে পরাগে
ঘুমের শান্তি ঝরে।
—মন যে কেমন করে
তোমার বুকের গোপন বাসাটি চেয়ে;
ঘুমোও, ঘুমোও, রিক্‌শাতে-চড়া মেয়ে;
স্খলিত শিথিল পা,
আর যে চলছে না।
ধীরে ধীরে চলি
ঘুমের তোমার ঢালাও সুযোগ পেয়ে।
একটু সবুর দাও না, দাও না
রিক্‌শাতে-চড়া মেয়ে।

*   *   *

আমার মনের থেমে গেছে যত
মোটর, ট্রাম ও প্লেন;

গতির বাহন আর তো সে চলে না।
আমার মনেতে এখন রিক্‌শা চলে।
সে-ও তো অমনি বলে,
আর আমি পারি না,
আর আমি পারি না।
আর আমি পারি না।
রাতের ছায়ার বাদুড়-পাখার তলে,
একটু ঘুমোও এখন সোয়ারী তাই।
একটু জিরেন চাই।
আর আমি পারি না।

* * *

এখন মনেতে আমার রিক্‌শা চলে,
শেষ হয়ে গেছে মোটর-প্লেনের চাকা
আমার মনের পাখা
গুটিয়ে লুকোয় রিক্‌শা চাকার তলে,
শুধুই ক্লান্ত, ক্লান্ত রিক্‌শা চলে ॥

মণীন্দ্র রায়
(১৯১৯)

ঘুড়ি

হে আকাশ, তোমার হৃদয়
কে কবে করেছে জয় ?
অবাক মানুষ তবু, সামান্য সে, অসামান্য আশা
খোঁজে দিন নীল শূন্যে ভাষা।

যতটুকু অবকাশ, হে আকাশ, দূরে ঐ যুবকের মতো
বিহারী মুচির ছেলে, ঘুড়ি হাতে আকাশে সংহত
কর্মক্লান্ত একান্তের ছুটি
ভরে মুক্ত লাটাইয়ের মুঠি।
দিন তার শিরদাঁড়া বাঁকা নত চোখে
পাদুকার পরিক্রমা টানে মৃত্যুলোকে।
ছেঁড়াখোঁড়া জোড়াতালি
হাতুড়ি বাটালি,
সেলাই, মোমের পাকে সুতো,
নেহাইয়ের কুঁজে কাঁটা, লাশে আঁটা জুতো
বহু যাতায়াত, বেদনাসুখের ইতিহাসে
সারাদিন ভিড় ক'রে আসে।
মেলে তারা রিক্ততার বিচিত্র পসরা ;
অকাল বার্ধক্য আর জরা
পদক্ষেপে ঘেরে যতো অলিগলি প্রেমের প্রাণের মৃত্যুঞ্জয়
ফ্যাসানে র‍্যাশানে ; দাঙ্গা শান্তির উভয়
বিপরীত আচরণে
উত্তেজিত মুখে, কান্ত মনে,
মধ্যবিত্ত রিক্ততায় ঋণী
মেলে ধরে আজন্মের ক্ষতির কাহিনী।
তালির কাঙালী ছাপে কালির পালিশ
একে একে ভোলায় নালিশ,
ফিরে যায় গোঠে
নধর মসৃণ ধেনু। মাঝে মাঝে চোখে ভেসে ওঠে
জুতোর বিজাতি ভিড়ে হয়তো বা আপনার গ্রাম
কোন দূর পরগণার তশিলে হারানো এক নাম।
রঙিন ঘাঘরা তার ভাঁজে ভাঁজে লাল
মাটির মাঠের ঢেউয়ে নদী হাসে রূপোর হাঁসুলি,
সবুজের বনে নীল পাহাড়ের বুকের কাঁচুলি
কল্পনার জালে বোনা, স্মৃতির সোনায়

কী স্বচ্ছ প্রবাসী বেদনায় !
উন্মূলিত মানুষের হৃদয়ে সে স্মৃতি ডালে ডালে
অর্কিডের দুঃসাহস জ্বালে।
দিনান্তে সন্ধ্যার বুকে নামায় হাতুড়ি,
তুলে ধরে দীপ্ত রাঙা ঘুড়ি।
কলিজার রক্তে ভেজা মুহূর্তের সে মুক্তিমহিমা
আকাশ, তোমারো ভাঙে সীমা ॥

ভোরের স্বপ্ন

দেখ তমস্বিনী মেলেছে চোখ
হেমকান্তি ঐ মেঘসমাজে !
আজ সূর্যোদয় মধুর হোক,
জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে।

এস রাত্রিশেষে ঘোমটা খুলে,
কর্মঘন আশা দু'চোখে জ্বালো,
শ্রমবিন্দু-ঘেরা কপালে চুলে
মুখশ্রী তোমার মানাবে ভালো !

যদি দীর্ঘ পথে কাতর হই
ক্লান্তি নামে এই অন্বেষণে,
পাব যৌবনের মরণজয়ী
স্বপ্ন, আহা, ঐ হৃদয় মনে।

তুমি বৃন্ত যেন, পাপড়ি আমি।
দীপ্ত শিখা তুমি, আমি আধার।
দুটি পক্ষ একই আকাশগামী,
দুটি পংক্তি মিলে একই পয়ার !

মুক্তি-খোঁজা দিনে প্রেয়সী তাই
ডাকি কণ্টকিত প্রেমের পথে।
তুমি সঙ্গী হলে কাকে ডরাই,
স্বর্গ জেগে ওঠে এই ধুলোতে ॥

আনন্দ, এবং আনন্দ

না, আমি হাওয়ার হাতে টিনের মোরগ যে আনন্দে
ঘুরে ঘুরে নাচে মানমন্দিরের চূড়ায়, কখনো
চাইনি তা। গলুই-লাফানো এই স্রোতে আদি-অন্তে
ভাঙে সংঘর্ষের ঢেউ, ক্লান্তি, নামে অশ্রুর লবণও।
তবু কুমোরের মতো শিল্প-স্নাত চেতনা আমার
কাঠামোয় খড় বাঁধে, তাল তাল বোবা মাটি ছেনে
মূর্তি গড়ে। কেননা জীবন এক ধৈর্যময় গবেষণাগার—
বিশাল কয়লার খাদে হীরা রেখে যে বলে : বেছে নে!

যা কিছু হয়েছে, হবে, সে কি জল-পড়ে-পাতা-নড়ে
এতো সোজা! বীজের খোলস ভাঙতে চারা কেন তবে
বাঁকায় পিঠের ধনু? নদী ছুটে যায় না সাগরে
টর্চের আলোর মতো ঋজু পথে? আনন্দের স্তবে
মুগ্ধ তুমি। তবু বৃন্দাবনে জেনো থাকে তারি নাম
যে কৃষ্ণ, যে সয় জ্বালা। বাকি সবি দাম-বসুদাম ॥

গত-অনাগত

আহা, আমি যদি তার মনের প্রান্তরে
পাশাপাশি বসে শুধু ঘাসের স্পর্শের
কোমলতা পেতাম স্নায়ুতে!
আহা, একবার যদি শাড়ির জামার

মোহজাল খুলে, ত্বক, রক্তের দাহের
ওপারে হৃদয় পারি ছুঁতে !

সে মেয়ে আমারই কাছে। আমি তবু তার
বুকের জভ্যার ঢেউয়ে সমুদ্র-আঁধারে
কখনো দেখিনি ধ্রুবতারা।
ঘুরেছি কেবলই তাই লবণ হাওয়ায়—
জোয়ারের ফস্‌ফরাসে দেখেছি শুধুই
শতচক্ষু ভয়ের ইশারা।

তবু কি ছিল না তার কামনা ? ও-মনে
নেই কি নিজেকে মেলে বিলিয়ে দেবার
রাজেন্দ্রাণী সুখ ?
আহা, প্রেম চোখে তার চিতল হরিণ
হ্রদের ওপারে, আমি পিছনে স্মৃতির
বাহুমেলা রাত্রির ভালুক ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

(১৯১৯)

লাল টুকটুকে দিন

তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ।
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল।
ফিরে দেখি সে আগন্তুক
ঘর আলো ক'রে বসে আছে পিলসুজে।

দিনে দূরে ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে।
ঠা-ঠা রোদ্দুরে পাইনি কোথাও ছায়া,
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে।
চোখ মুছি—
তুমি স্বপ্ন ?
না, তুমি মায়া ?

আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি
গলুক
বুকের
অশ্রুজমাট শিলা।
দাও তুমি ভালোবাসাকে জন্মভূমি
ঘৃণার ধনুকে
আমি টেনে বাঁধি
ছিলা।

সারাদিন গেল।
কেন দিলে নাকো দেখা ?
ফুৎকারে দিকপৃথিবী আঁধার করে ?
বুঝি সেই রাগে
ঝঞ্ঝায় একা একা
এখনও বজ্র আকাশকে ছেঁড়ে খোঁড়ে ?

দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের
ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন॥

একটি কবিতার জন্যে

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত এক দিনের ফতোয়া
মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে
মিছিলে এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে॥

ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে-হলুদ-দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে ॥

সালেমনের মা

পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ।
তার নিচে পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে
বার বার পিছিয়ে প'ড়ে
        বাবরালির মেয়ে সালেমন
                খুঁজছে তার মাকে।

এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি,
        সালেমনের মা ?
বাবরালির চোখের মতো এলোমেলো
        এ আকাশের নিচে কোথায়
                বেঁধেছো ঘর তুমি, কোথায়
                        সালেমনের মা ?

মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে
        পিচুটি-পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে
                তোমাকে ডাকছে শোনো,
                        সালেমনের মা—

এক আকালের মেয়ে তোমার
আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে
তোমাকেই সে খুঁজছে ॥

এখন ভাবনা

(১)

এখন একটু চোখে চোখে রাখো—
দিনগুলো ভারি দামালো ;
দেখো,
যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামালো দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
      গড়াতে গড়াতে
            আগুনের মধ্যে না পড়ে।

আমার ভালোবাসাগুলোকে নিয়েই
আমার ভাবনা।
এখন সেই বয়েস, যখন
দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—
শুধু কাছেরটাই ঝাপ্‌সা দেখায়।

এখন সেই বয়েস, যখন
আচম্‌কা মাটিতে
প'ড়ে যেতে যেতে মনে হয়
হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভালো হতো।

(২)

পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র ;
দেয়ালে গুলীর দাগ,
ভাঙা শ্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
            ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত।

মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নিচে
যৌবনকে পণ ধরেছিল জীবন।

ঠিক তেমনি দূরে,
কত দূরে ঠিক জানি না,
আজও দেখতে পাচ্ছি—
হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে।
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তার বলিষ্ঠ হাত দুটো আমি দেখতে পাচ্ছি
আমি শেষ বারের মতো
মাটিতে প'ড়ে যাবার আগে
আমার ভালোবাসাগুলোকে
নিরাপদে তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই॥

গোবিন্দ চক্রবর্তী
(১৯২০)

নাগরদোলা

খুঁজছি কারে বুঝছি নাকো
যুঝছি তবু শুধু—
আন্তিকালের শূন্তি ঝরে
বুকের মাঝে ধূ-ধূ

আকাশও কি তারেই খোঁজে
অনন্তকাল ধ'রে,
চরকিপাকের মতন যে এই
পৃথুল পৃথ্বী ঘোরে—
এই পৃথিবী পাক দিয়ে ঐ চাঁদ
সর্বনেশে হায় রে খোঁজার সাধ!
বাসুকি যে রাগ রেখেছে পুষে
সেই ছোবলে উথলে সাগর
হঠাৎ ওঠে ফুঁসে।
ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন
কোথায় সে দিনরাত।
কী অসহ্য ফোস্কা-পড়া তাত।

সেই আগুনের তাতেই না কি
সৃষ্টি পুড়ে খাক—
এরি মধ্যে আছে তবু
কোথাও কি মৌচাক।
টুপ টুপ টুপ ঝরছে মধু
তারা থেকে তৃণে—
হঠাৎ এসে কয়েকজন তার
খানিক নিয়ে চিনে,
ধোঁকা কিংবা দ্বিগুণ ধাঁধার
লাগায় দারুণ তাক্—
বাদবাকি খায় হাবুডুবু
কিংবা ঘূর্ণিপাক।

কী সত্যি কী মিথ্যে
কিছুই নেইক জানা—
তবু খুঁজতে তো নেই মানা,
সাতসাগরের তীরে নাকি
জল হাতড়ায় কানা॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

(১৯২০)

অবিনাশ বটব্যাল

দেয়ালে এ-কার ছবি অবিনাশ বটব্যাল, তুমি
এমন তন্ময় হয়ে দেখছো ? পুড়ছে হাতের চুরুট :
দশ বছর আগের বৈশাখে কোন আশ্চর্য মৌসুমী—
হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কাসুন্দে খুরুট !

সিগারেটে ধোঁয়া ছাড়তে স্নিগ্ধ হেসে ; বুকের ইজেলও
বর্ণোচ্ছল ; বিলোল কটাক্ষে হতো প্রেমিকা উজ্জ্বল ;
মনে ভাবতে, তোমার পিছনে আছে মাইকেল এঞ্জেলো ।
তারপর সময়-নদীতে কতো বয়ে গেছে ঢল !

প্রেম কি ত্রিকালদর্শী, বল্গাহীন ইচ্ছার সওয়ার ?
জীবনটা কি বেতবনে শালিকের ক্ষণিক আশ্রয় !
অথচ তুমি কি জানতে কী আনবে যে দিনের জোয়ার ?
প্রেমিকা কি জেনেছিল সে কোনো আলোকলতা নয় ?

অবিনাশ বটব্যাল, চুরুটটা পুড়ে যাচ্ছে হাতে :
তুমি কি নক্ষত্র দেখছো ? ঢেউ ভাঙছো হারানো নদীর ?
চড়ুয়েরা খড়কুটো রেখে যাচ্ছে কড়িবরগাতে ;
স্কাইলাইট মাথার ওপরে,—ওরা বাঁধতে চায় নীড় ।

কাসুন্দিয়া এতোদিন কন্যাট প্লেসের বাতায়ন
ভাবেনি তো ! অবিনাশ, প্রৌঢ় তুমি, মেনে নাও সবই—
ভালোবাসা মজে যায়, হৃদয়েরও আছে জরায়ণ ;
কালের গোপন ফুঁয়ে আলো নিভে, ঝাপসা হয় ছবি ।

কালেরও প্রৌঢ়তা আছে, ইতিহাসচেতনায় তুমি
আজ যে আলেখ্য দেখছো, আলোকবর্ষের কোনো তারা
জ্বলে উঠে মরে গিয়ে ফলিয়েছে আশ্চর্য মৌসুমী
কোথাও, কোথাও আজ প্রেমশূন্য হৃদয়—সাহারা !

অবিনাশ, কী যে ভাবছো, প্রৌঢ়তা বয়সে নয়, মনে ;
সুভগ আলোর থেকে পলিত কালের হাতে তুলি
ইতিহাস তুলে ছ্যায়, অনিবার্য ইচ্ছা রূপায়ণে
তুমি তো সক্রিয় আছো, দ্বিধা-ভয়ে কাঁপেনি অঙ্গুলি ॥

গোলাম কুদ্দুস

(১৯২০)

জিরাফের গলা

নিম্নের পল্লবপত্র লতাগুল্ম শেষ,
সপ্ত জাহান্নম জ্বলে অশান্ত জঠরে,
একটু উঁচুতে বহু পত্র সমাবেশ,
মগডাল হ'তে শত স্বপ্নসুর ঝরে।
গলাটা বাড়িয়ে দিল ক্ষুধার্ত জিরাফ
ঊর্ধ্ব শাখাপল্লবের অমৃত আস্বাদে,
সব পাতা ফুরানোর এলে অভিশাপ
জিরাফের গলা যাবে পত্র-খোঁজে চাঁদে।

অফুরন্ত পথযাত্রা ফসলের ডাকে,
স্বর্গগামী প্রেম এক ব্যাহত কামনা,

দেশে দেশে ঘরে ঘরে খোরাক পোষাকে
দুর্জয় বিরামহীন চাঁদের সাধনা !
সুধার নিশ্চিত নতি দুরন্ত ক্ষুধাকে,
নরক স্বর্গের দিকে চলে অন্যমনা !

চিত্ত ঘোষ

(১৯২০)

শুদ্ধ সীমায় যেতে

নিয়নে নিয়নে শহর অন্ধকার
নিয়নে নিয়নে অন্ধকারের আলো—
স্রোতে তরঙ্গে পাথরে ধুলায় কত শোক পার হই
কত কমনীয় মুখের ফাটলে প্রতিবিম্বের শিকড়
খুঁজে খুঁজে খুঁজে মাটিতে কুড়িয়ে পাই
কত আলোকিত মুখের গোধূলিছায়া।

ভিন্ন স্মৃতির সমারোহ শেষ, ঘুমের মোমের আলো
প্রবাহিত নদী সুদূর শীতল চোখে
বিষণ্ণ বিষাদ চিহ্নিত শাখা, রৌদ্র আবহমান
শুকায় শিকড়, প্রবলতা পীড়া, জাগে লুম্বিনীরাত
পাথরের সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে মর্গের দরজায়
সারারাত জলে শোকের অগ্নিশিখা।

পুরোনো পাতাল প্রতিবিম্বিত পলে
পুরোনো রাত্রি গলে গলে স্মৃতি, নদী

হেঁটে হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিকে পায়ে বেঁধে
আমি নির্জন শোকের পাথরে বসি।
চোখের দুধারে প্রতারণা, সুখ, শোক
আমি হাত রাখি কোন প্রবাহের জলে।

আড়ালে মগ্ন, শূন্য, কাতর বালু
দুরন্ত রেখা সমান্তরাল দ্বিধা—
প্রতিধ্বনির পেছনে পেছনে কারা
গোধূলিছায়ার আলোকিত মুখ খোঁজে।
হেঁটে হেঁটে হেঁটে কবে আমি সেই
শুদ্ধ সীমায় যাবো!

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৯২০)

পিকাসোর জন্য

এই এক ছবি দেখি, দিন রাত দুর্বোধ্য আয়নায়
বিকেলের মতো এক ক্লান্ত নারী রহস্য বিতরে ;
কিংবা আমাদের মন আছে কিনা, অস্ফুট বার্তায়
প্রশ্ন শুনি যেন ; কিংবা যতটুকু এ হৃদয়ে ধরে
ততটুকু নিতে গিয়ে দেখি ছবি অগাধ গভীর
কোথায় যে নিয়ে যায় ? তারপর সকলি নিবিড়
চেতনা, চেতনা শুধু! এক ছবি বহু ছবি হয়
তখন কি ? তখনো কি নিরুত্তর কিছু প্রশ্ন থাকে ?
পৃথিবীর সব নিয়ে, তবু যেন সব পাওয়া নয়
এমনি অভাব ?···যারা আয়নায় ক্লান্ত মুখ রাখে

তারা তো একটি মেয়ে ; তবু তারা কেমন ছড়ায়
সর্বত্র ; সর্বত্র তারা অব্যর্থ অস্বস্তি রেখে যায়
চিলে ঘরে, রাস্তায়, এভিন্যুয়ে, উদ্বাস্তুমিছিলে,
অথবা প্রথম প্রেম-গুঞ্জনে কি বিবাহসভায় !

প্রভাস

স্মৃতির বালুচরে মুখেরা ভিড় করে
কেন যে ভিড় করে ? আমি তো ক্লান্ত ।
এখানে নদীপারে গোধূলি গান ধরে
আকাশ নীলে নীল ; হৃদয় শান্ত ;
ঘুমাবো আমি তাই ঘুমপাড়ানি গানে
ভরেছে চরাচর মিলেছে প্রাণে প্রাণ
তবুও ভিড় করে ; মুখেরা ভিড় করে ;
অতীতে এত জ্বালা ; কে আগে জানতো !

দোসর কেউ নেই, চাইনে মিতালিও
তবুও পিছু ডাকে বিদুর, পার্থ ।
কী হবে প্রেম দিয়ে, দেহের জ্বর সেও ;
রাধার মুখ তবু কেমন আর্ত ।
ঘুমুতে চাই আমি মাটিতে বুক মেখে,
মরণ চাই আমি আকাশে মুখ রেখে ;
তবুও হাঁটে তারা ক্ষুব্ধ বলরাম,
অন্ধ কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্র ।

তোমরা ফিরে যাও । কোথায় দ্বারকায়
নারীর দেহমদে পশুরা লুব্ধ ;
কোথায় শিশুকেও জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়
আহত নেকড়েরা ; এমনি যুদ্ধ !

কী হবে ঘুম থেকে সে দেশে হেঁটে গেলে ?
সুদর্শন আমি দিয়েছি ছুঁড়ে ফেলে।
এখানে এই ঘাসে হৃদয় ঢেকে নিয়ে
ঘুচাবো দ্বন্দ্বের জয়ের ক্লান্তি।
বলো না কথা পাখি, আস্তে ঝরো ফুল ;
ঘুমের রাত আসে। শান্তি, শান্তি !

বটকৃষ্ণ দাস

(১৯২১)

একটি নদীকে নিয়ে

এখনো অনতিক্রান্ত হৃদয়ের ক্লান্ত অন্ধকার,
রাত্রির সীমান্তভূমি। সংঘবদ্ধ অরণ্য, পাহাড়
চারিদিকে। মধ্যে নদী, পথভ্রান্ত। তবু অবিরাম
পথেরই অন্বিষ্ট তার। অনিবার্য কী যে পরিণাম
আছে তার, এই দিন রাত্রির কঠিন রূঢ়তায়,
জানেনা সে। সংকুচিত সাম্রাজ্যের সীমিত সীমায়
দৃষ্টি তার প্রতিহত। তবুও আশ্বিন বীতরাগ।
সময় চলেছে ক্ষ'য়ে। নদীতে ক্ষয়ের কালো দাগ।

কী আশ্চর্য নিয়মের হাত ধরে চলেছে সময় !
প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তের এই ক্লান্ত অবক্ষয়
তবু তার কান্না নেই। তবু তার সরল, সহজ
অর্থ নেই অভিধানে। যদিও এখানে রোজ রোজ

মৃত্যু আসে। হৃদয়ের কামনার প্রাঞ্জল আকুতি
শেষ হয়। রৌদ্র যায়। সন্ধ্যা আনে তিমির প্রস্তুতি

তবু এক গান থাকে। সেই গানে এ নদীর বুক
একটি জোনাকি হ'য়ে ঝরে যদি, ঝরুক, ঝরুক ॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(১৯২১)

মেঘবৃষ্টিঝড়

১

চলে এলুম তোমায় ছেড়ে চলে এলুম।
সখী আমার হারানো দিন ভালবাসার ভীরু আশার,
তবু তোমায় ছেড়ে এলুম ছেড়ে এলুম।

চষা জমির কানে কানেই ভোরবেলার সোনালি গান
গেয়েছিলুম পেয়েছিলুম তার বুকেই ফিরে আসার
ইশারা : প্রাণ, সবুজ ধান, সোনালি ধান।

তবু কখন ঈশানে মেঘ ঈষৎ চায়—
তবুও তার ধূসর চোখ ঘূর্ণি-ঘুরঘুর হাসার
মাটির বুক ফাটার সুখে প্রাণ বাঁচায়!

কোথায় ঘরে মিলিয়ে যায় সখী তোমার তাল-তমাল।
মরাই নেই, ধান-ও নেই সবুজ ধান ভালবাসার।
ঈশান আনে জোর তুফান, ঘোর আকাল।

২

সব শেষ ?
সবুজ দিন, শ্রান্তিহরা আকাশ নেই নেই—
সব শেষ ?

ছাড়াই মাঠ, ছাড়াই হাট ধূসর পায়ে পায়ে
মিলছি ভুখ-মিছিলে গায়ে গায়ে,
কারখানায় অন্ধ, দিকভ্রান্ত, ভয় ভয়,
মনের দিকপ্রান্তে ঠিক সন্ধ্যা হয় হয়,
ভালবাসার
ভীরু আশার
এই কি শেষ নয় ?

কখন এরি মধ্যে সেই আশার হাতছানি—
তোমায় খুঁজি ; এদিক-ওদিক চলছে কানাকানি।
কোথাও তুমি নেই যে তা-ও জানি।
সেই তোমার সবুজ শাড়ি, কালো কাজল-চোখ
ছিঁড়ল টেনে সংগ্রামের সংঘাতের নখ।
সময় নেই, সময় নেই
কবে জানাই শোক।

তবু জানাই শোক !

হঠাৎ কালো হাওয়ায় তাই কিসের গুঞ্জন।
যন্ত্রে যদি মেলাই হাত মেলায় হাত মন,
কিসের গুঞ্জন।
স্তব্ধ মেঘ লক্ষ বুকে হৃদয় দেয় শোধ।
যন্ত্রণায় যুদ্ধ। প্রতিরোধ।

আকাশভরা হাওয়ায় ঝরা-পাতার মর্মর
—কখন এল ঝড় !

৩

শেষরাত্রে মরুধূসর ঝড় এল।
তারপর হঠাৎ এলোমেলো
হাওয়া, হাওয়ায় বৃষ্টি নামল।
তারপর কখন ভোরের চমক। বৃষ্টি থামল।

৪

জানতুম। তুমি ঘোমটা-টানা ফুল রজনীগন্ধা,
লজ্জা-পাওয়া রাঙিয়ে-ওঠা সন্ধ্যা—
নিতান্ত এক গাঁয়ের মেয়ে।
ধান ভানতে, জল আনতে
অজান্তে পথ বেয়ে।

সুখেই ছিলুম এমন দিনে আকাল এল।
ঘর ছাড়লুম, জীবন কী যে দশায় পেল!
সঙ্গে তুমি। পথ হারালে
পা বাড়ালে
ঝড়ে।
রইল না কেউ ঘরে সুখের ঘরে।

তারপর সেই ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ-জাগা অন্ধকারে আবার দেখি তোমায়:
পাগলা হাওয়ায় চুল উড়ছে
চুল ঘুরছে
জ্বালামুখীর সাপ—
চোখে তোমার প্রলয়-পীত তাপ—
তখন আবার ভাবলুম, একি তুমিই? তুমি সুখী তো নও!
প্রাণের মধ্যে আজও আদিম আগুন কি বও?
তাই কি ঝড়ের হাজার ফণায় আগুন জ্বলে?
তারপর সেই আগুন গলে চোখের জলে।
আমার মনের আবাদ ভরে বৃষ্টি ঝরে···সোনা-ও ফলে।

গান ধরলুম আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ফিরব যখন ভাঙা বাসায়—দাওয়ায় মাটি লেপে
চাষ করব, গান ধরব, ধান-ও দেব মেপে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

তারপর কখন ভোর হয়েছে
বৃষ্টি নেই, হাওয়ায় আলোর ঘোর রয়েছে।
উঠে বসলুম,
সুখে হাসলুম
মনে ভাবলুম—এবার তুমি আসবে,
আবার ভালবাসবে।
আবার আমি ঘর বাঁধব, মন সাধব জীর্ণ দেহে
জীবনকে ফের গড়ে তোলার গভীর স্নেহে॥

জননী যন্ত্রণা

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে—যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ায় হা-হা-হা-হা
পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা-টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পরে মূর্ছা বোন : ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মত এক কোণে বউ, দুয়ারে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।
    এক-যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে ছেলে মা
    ঘর যে তোমার ঘরে ঘরে, জননী যন্ত্রণা॥

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল তুকূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও-কার নৌকো, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?

সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কে ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ-বা কলে-কারখানায়।
একটি তারা-পিদ্দিম কখন হাজার তারা জ্বালে :
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে :
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা ॥

হাসো

হাসো। শুধু শিউরে ওঠো শরীরের সেতারে ঘা দিয়ে।
নিঃশব্দ ঝঙ্কার হাসি চোখের তারায় মুদারায়
ভাঙুক ভ্রূ-তুটি, রেখা একটি-তুটি কপালে—আত্মায়
ঘাটে ঘাটে উঠে এসো রিন্‌রিন পেশীতে পা দিয়ে।
আলো অলৌকিকআভা অন্ধকারে আচমকা ফোটাও
হাসো—হও জীবনের বনস্পতি হাসিধারাজলে
শাখায় পল্লবে লোভমদমৃত্যু, হাসো ফুলে ফলে
যন্ত্রণাভূস্তর ভাঙো অশ্রুরস শিকড়ে ওঠাও।

দিলে তো আমাকে সব, সুখ স্বস্তি সংসার সন্ততি
কলরব অবরোধ বর্তমান সুস্থ মতিগতি—
হাসো। শুধু একবার আমাকে তোমার হাসি দাও।

চৌদিকে চল্‌কায় মন আমি দ্বীপ আমি দূরে-থাকা
নির্জন আমার হাসিজনাকীর্ণ করো—দাও একা
ভূত ভবিষ্যৎ স্মৃতি স্বপ্ন মনপবনের নাও ॥

দিলীপ রায়

(১৯২১)

দিনলিপি

পাহাড়ে হাওয়ার শব্দ প্রতিহত ; মাঠের ওপর খেলা করে হাওয়ার তরঙ্গ
বাঁশীর স্থরের মতো ; মাঝে মাঝে নির্জনতা ভেদ করে হুইশ্‌ল্‌,
কেউ নেই আর ; শুধু অনেক সময় প'ড়ে আছে অলস রৌদ্রের মতো
স্থবিশাল মাঠে। রাঁখাল চরায় গরু ; কৌতূহলী কতক বালক
দেখল ক্রীড়ার মধ্যে অদ্ভুত ট্রেনের গতি ; তারপর নীরবতা,
বিকেলে, সন্ধ্যায়।

এই চিঠি লিখব যাকে, সে হয়তো এখন নাগরিক জীবনের
জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ ; আতঙ্কিত বিনিদ্র রজনীতে
ত্রাসে জপ করে অমুচ্চারিত ব্যাকুল প্রার্থনা : যুদ্ধ যেন না ঘটে।

কিন্তু এখানে সে সব ভাবনা নেই ; এখানে আকাশে আলো,
রাত্রে দীপ্ত তারার সমারোহে হয়তো হারিয়ে আছে স্পুট্‌নিক
নিক্ষিপ্ত নক্ষত্রলোকে ; অন্যমনস্ক, আবিষ্কার করি সকালের
সেই তীব্র লাল গোলাপকে, অন্ধকারেও যে গৌরবে মুখ
বিকশিত ক'রে তুলে ধরে একটি চুমার জন্যে যেন।

এই একটি লাল ফুল দানবদের হাতে দিয়ে
দেখতে ইচ্ছে করে তারা কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলতে পারে কিনা যুদ্ধ,

অথবা দেব এটি, সৌন্দর্যের প্রতীক সৌজন্যসম্মত উপহার
কোন বিদেশিনীর ফুল্লকুসুমিত হাতে, বিনিময়ে পাব
কেবল একটি ছোট্ট
ধন্যবাদ ॥

অরুণকুমার সরকার
(১৯২২)

রিখিয়ায়

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে ।
প্রেম জাগে দু'নয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার ।

ও হাওয়া, পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও,
উজ্জ্বল রৌদ্রের সঙ্গে হেমন্তদুপুরে,
কার স্বপ্ন বীজধান্য দু'হাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘুমে দূর থেকে দূরে !

সোনালি ধুলোয় ওড়ে তার লাল চুল
চুলের কস্তুরী গন্ধ তার কথা বলে
তার কথা লতাপাতা ছায়াবীথিতলে
মায়াবী মহুয়াবনে মাটির পুতুল ।

মাটির পুতুল, প্রেম, ক্ষণিক সময়
আমার সামান্য আশা, পরিমিত দিন ।
এই আলো, ঝলোমলো আহ্লাদী নবীন
অসহ্য অপরিসীম দৈবী অপচয় ।

আনন্দ আনন্দ ঝরে আমার কৃপণ
হৃদয়ে আনন্দ ঝরে, মধু ঝরে চোখে
স্নান করি রূপরসগন্ধের আলোকে
দূর আর দূর নয়,—আত্মীয়, স্বজন ॥

আকাশকুসুম

আকাশকুসুম, তুমিই আমার সুখ
এই রঙ, এই ঢঙ বদলাও ব'লে।
সম্ভাবনার গন্ধে ভরাও বুক
শহর যখন নিষ্ঠুর পায়ে দলে
বকুল ফুলের স্পর্শকাতর দেহ।

অপেক্ষা করো দয়ার্দ্র সন্ধ্যাতে
ঠিক সেইখানে, যেখানে তোমাকে চাই।
নগরপালের দৃষ্টির এলাকাতে
আমরা দু'জনে গোপনমিলনে যাই
রচনা করতে নীরবনিবিড় স্নেহ।

এবং কুয়াশা মশারি চতুর্দিকে
ম্লান জ্যোৎস্নার সুদূরমেদুর হাসি
অর্থগভীর অস্ফুট আর ফিকে
যে সব শব্দ ভালোবাসে, ভালোবাসি,
যে-সুর ক্লান্ত প্রেমিকজনের প্রেয়।

আকাশকুসুম, আমাদের যৌবন
শরৎকালের ভোরবেলাকার মতো।
সময় করেছে দেহ ক্ষতবিক্ষত
মন তাকে তবু করিনি সমর্পণ।
যা কিছু দেবার তোমাকেই সব দেয় ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

(১৯২২)

আমার স্ত্রী

তোমাকে দেখেছি কবে মহীয়সী ঐশ্বর্যে সৌরভে—
স্বাচ্ছন্দ্য বা খুশি-ঘেরা অনিরুদ্ধ উদ্দাম উল্লাসে,
চুলের পতাকা মেলে দিব্যস্বাদে একান্ত উজ্জ্বল,
বর্ষার ঘাসের মতো টকটকে সতেজ সবুজ,
কিম্বা এই শরতের গাঢ়নীল আকাশের মতো,
অথবা বসন্তবনে জীবনের সোচ্চার প্রকাশে ?

দুহাতে রুখেছো দস্যু—অভাবের দারিদ্র্য-দানব,
কতদিন অনশনে হাসিমুখে বাসাংসি জীর্ণানি
দিয়ে শুচিস্মিত বরতনু রেখেছো মহান করে।
দিবসে সংগ্রাম স্থরু ;—সংসারের চাকরানী যেন।
ন'টাতে স্বামীর ভাত, ছেলের স্কুল, অন্ধ শ্বশ্রূর
সেবা সেরে হয়তো বা দুপুরে সেলাই, তিনটেয়
জল এলে বাসনের কাঁড়ি মাজা, ক্ষার-সিদ্ধ কাচা :
সন্ধ্যায় হিসাবমতো বাঁধা কাজ, স্বামী-পুত্র-ঘর।
তারপর রাত এলে—স্নিগ্ধ স্বর—'কি গো, ঘুম এল ?'

অরুণাচল বসু

(১৯২৪)

তুমি তো আকাশ আজ

তুমি তো আকাশ আজ
আমি স্তব্ধ মাটি,

মাঝখানে দোলায়িত
অবশিষ্ট স্বপ্নের ছায়াটি।

আকাশে বজ্রের শব্দে
বিস্মৃতির ডাক,
আবেগের শীর্ণ শাখা
তাও বুঝি পুড়ে হয় খাক!

অতীতের রাত্রে ডাকে
উজ্জ্বল আগামী—
তুমি শূন্যে থাকো, মূক,
সাড়া দিতে চ'লে যাই আমি ॥

… … …

রৌদ্রের দিন উধাও আকাশে নীল-নীলান্ত বেলা—
শাখারা দাপায় দু'বাহু বাড়িয়ে শূন্যে,
হুঙ্কার হাট, লু-ওড়ানো মাঠ, লাঙল ছড়ায় ঢেলা
বাবলা-ছায়ায় রেখা এঁকে যায় ঘূর্ণি।

শালিখেরা নীড়ে ঘুঘু একপায়ে ঘুম-ঢুলু চোখ বোজা,
মন্থর হাওয়া দিক থেকে দিক পাড়ি
দিতে গিয়ে বাধা পেয়ে আমবনে ঢালে মুকুলের বোঝা
বৈশাখ! ওড়ে বহ্নির তরবারি ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

(১৯২৪)

ইজেল ও বুনো পারাবত

আমীরালি এভেন্যুয়ে গুলমোরের হলুদ ছড়ানো।
মুগ্ধ ছাতিমের ছায়া চকিত শালিখটিকে ছুঁতে চায়,
চকিত শালিখটিকে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে
বারে বারে ছুঁতে চায়।
ট্রামের মর্মর বাজে বুল্‌ভারে,
ঘনশ্যাম ঘাসের ভেল্‌ভেটে
সহসা বৃষ্টির দাগ লেগে থাকে অকারণ-স্নেহের মতন,
বুনো পারাবত ওড়ে নীল-কালো আকাশে যেন
ক্লান্ত শরীরের ছুটি সুইমিংপুলের স্থির জলে।

সেখানে তরুণ শিল্পী—আর্ট স্কুলের—একলা ইজেল নিয়ে বসে,
ক্রিকেট-মাঠের তাঁবু
এই-রোদ-এই-ছায়া খেলা দেখে ইজেলের গায়ে।
বুনো পারাবত ওড়ে
মুক্তির নীরব গান নীল-কালো আকাশে।
'দোতলা বাসের মধ্যে একগাদা যাত্রীর ভিড়ে',
মনে ভাবে তরুণ ছেলেটি,
শান্তাদি কেমনধারা আরেক বন্ধুর সঙ্গে—মানে সে বান্ধবী—
চেঁচিয়ে বলছিল তার পরীক্ষার কথা অনর্গল
এম্নি সময়ে কালো দু' নম্বর নীল স্টেট বাসে
রাস্তায় বৃষ্টির জলে যখন
চমৎকার আলোছায়া;
হাপুসনয়নকান্না স্টলের ক্যানভাসে
সমুদ্রের মতো থৈথৈ—
ভবানীপুরের সিক্ত সুন্দর জুলাই।

শান্তাদি সুন্দরী নয়, তবু তার দেহের ভঙ্গিতে
কোথায় কোথায় যেন ভাস্কর্যের স্পষ্ট ছাপ আঁকা—
দৃঢ় নমনীয় গ্রীবা, অবিকল কণ্ঠস্বর যেন ছাঁচে ধরা,
স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না, মধুরও না,
নাচের ঘুঙুর যদি আরো চাপা হত,
ট্রামের মর্মর যদি ঘনশ্যাম ঘাসের ভেল্‌ভেটে
আরেকটু অস্পষ্ট হত, আরেকটু সংযত,
তাহলে অনেকটা যেন শান্তাদির স্বর হত তারা।
রবীন্দ্রসংগীত গায় কেন যে শান্তাদি,
কেন যে বাংলা পড়ে এম-এ ক্লাসে,
কেন যে এমন রোদে বৃষ্টিতে বর্ষায়
ইজেলের সামনে এসে না দাঁড়িয়ে
অনর্থক গল্প করে, নীল স্টেট বাসে, সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে
কে জানে ?

গুলমোরের হলুদ ছড়ানো এভেন্যুয়ে
আর্ট স্কুলের তরুণ ছেলেটি
যতক্ষণ রোদ ছিল আকাশের ছাদে
দেখেছে দু-চোখ ভরে যতদূর চোখ যায়
বুনো পারাবত ওড়া—
শান্তাদির আত্মার মতন ॥

নরেশ গুহ

(১৯২৪)

শান্তিনিকেতনে ছুটি

দূরে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে বসে আছে।
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাঁচে

বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল।
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয় তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙায় ওঠাতে।
পারলেও অভিজ্ঞান সে অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না পাবে না তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।
যদি পায় ?
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়
—দেরি হোক, যায়নি সময় ?

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউণ্টর চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ-ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাশ
কাল থেকে ফের। ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙা ভাঙা গলা
কবে সে মন্থর পায়ে পাতাঝরা ছাতিম তলায়
একা এসে ঘুরে গেছে ? ঘণ্টা শুনে হঠাৎ কখন
অকারণে দিন গেল। ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই ? যদি সে নিজেই এসে থাকে ?

বিকল্পে উটের সার

বিকল্পে উটের সার, জীবনের গতায়ু বছর।
বালির দুর্গম তাপ, অস্থিসার উপত্যকা, কঙ্কাল-করোটি-খসা ঝড়
পায়ে পায়ে সঙ্গ নেয় ; জলের উতল গন্ধে
খেজুরের কৃশ ছায়া খুঁজে
ক্রমশ শুকিয়ে আসে সঞ্চয় যা ছিলো মেদ কুঁজে।

ধ'সে পড়ে দিনরাত, আলো ফাটে, ছায়া দীর্ঘ হয় ;
শান-দেওয়া অন্ধকারে ক্ষ'য়ে যায় নক্ষত্রবলয়।
তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ ;
ভয়ার্ত ত্রিলোক
মানে না মনসার বনে শূন্যে তোলা অভয়মুদ্রাকে।
অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে-যে ফল পাকে।
অঙ্গার পথের ধুলো, আকাশ মূর্ছায়
ঢ'লে পড়ে ডাইনির গুহায়।
এবং হাওয়ার আগে দিক দেখায় কপট প্রেতেরা।
বিকল্পে—উটের সার
কখনো ফিরবে না আর,
যেহেতু সম্ভব নয় ফেরা,
যদিও অকল্পনীয় রাত্রিশেষে নগরের দ্বার,
বাগানে পাখির গান, ঈশ্বরের ঘুমন্ত সংসার॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(১৯২৪)

মৌলিক নিষাদ

পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটিও তারা আজ।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই। আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।

এই এক আশ্চর্য সময়।
যখন আশ্চর্য বলে কোন কিছু নেই।
যখন নদীতে জল আছে কি না আছে.
কেউ তা জানে না।
যখন পাহাড়ে মেঘ আছে কি না আছে
কেউ তা জানে না।
পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই ;
যখন মাটিতে আলো নেই।
যখন সন্দেহ জাগে, আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল ?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল ?
আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোন-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে।

পিতামহ, আমি সেই ভয়ের নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি,—রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
মনে হয়। আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।

অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ—এই ভয়॥

মাঠের সন্ধ্যা

অন্যমনে যেতে যেতে হঠাৎ যদি
মাঠের মধ্যে দাঁড়াই,
হঠাৎ যদি তাকাই পিছন দিকে,
হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে বিকেলবেলার নদীটিকে।

ও নদী, ও রহস্যময় নদী,
অন্ধকারে হারিয়ে যাসনে, একটু দাঁড়া ;
এই যে একটু-একটু আলো, এই যে ছায়া ফিকে-ফিকে,
এরই মধ্যে দেখে নেব সন্ধ্যেবেলার প্রথম তারাটিকে।

ও তারা, ও রহস্যময় তারা,
একটু আলো জ্বালিয়ে ধর, দেখে রাখি
আকাশী কোন্ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায় দিকে-দিকে।
দেখে রাখি অন্ধকারে উড়ন্ত ওই ক্লান্ত পাখিটিকে।

ও পাখি, ও রহস্যময় পাখি।
হারিয়ে গেল আকাশ-মাটি, কান্না-পাওয়া
একী করুণ সন্ধ্যা ! এ কোন্ হাওয়া লেগে।
অন্ধকারে অদৃশ্য ওই নদীর দুঃখ হঠাৎ উঠল জেগে।
ও হাওয়া, ও রহস্যময় হাওয়া ॥

অরুণ ভট্টাচার্য

(১৯২৫)

তাসের মঞ্চ

তাসের ঘর। নীরব মঞ্চে কঞ্চুকীর সাড়া
মিলবে না আর। নিবিড় আলো ; দ্বিধাগ্রস্ত

অভিনয়ের শেষে
সাহেব বিবি যে যার আপন চরিত্রকে নিয়ে
ব্যঙ্গ করলে।

সাত-সকালে লতাপাতার কাঁটাঝোপের বেড়া
ডিঙিয়ে শশক ছুটলো তখন ;
ঊর্ধ্বগতি আকাশ
শুনলো না তার কথা।

সাহেব বিবি তাসের ঘরে
আজব দেশের গল্প করলে বসে,
সত্য মিথ্যায় সাত-সকালের
আসর হলো মাত।

বৃষ্টি নামলো।
অঝোর জলের ধারাস্নানে
রাত্রিবেলার জমাট আসর ভাঙলো অবশেষে।

জলের ধারে শশক এসে থামলো একবার,
পরক্ষণে মুখ দেখলো জলে।
সাহেব, নাকি বিবির মুখ
ভাসলো নীল জলে!

মৃগাঙ্ক রায়

(১৯২৫)

মারীচ

আমার প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রো না।
বৃষ্টি, বৃষপাল মেঘ, মরুভূমির রাবণ

রৌদ্র, স্বেদ, ঘুরে ঘুরে
ফের ঘুরবে—বহু শব্দ, শব্দহীনতা
ক্লেদ, তুয়ারের দৃঢ় অন্ধকার।
আমি আমার বাইরে থাকব
তুমি আসবে অনুমানে।

অথবা তুমি অযোধ্যা নগরে যাও
কিংবা ইন্দ্রপ্রস্থে সুস্থির সমাহৃত নাগরিক।
যাও যার প্রতীতির অলীক শুভ্রতা রাজহংস
নির্লিপ্ত নদীতে, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষ কোনো
বেছে নাও—যার ঘরে অহংকারের উদ্ধত ভ্রূ
মানবে নিশ্চিত, যার বাহুর স্পর্ধার নিচে
উলঙ্গ-সুভদ্রা ভয়ংকর বিস্ফারিত।

আমার প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রো না।
আমি শরীরে রাক্ষস রেখে মারীচের মতো
মায়াবী হরিণ॥

রাম বসু

(১৯২৫)

বীজের রোদসী কন্যা

অলৌকিক শক্তি নেই অপহৃত প্রফুল্ল কানন
এখন নিজের ভার নিজে নিতে হবে
আমাদের পরিমাপ আমরা তু জন।

অভিজ্ঞ আঁধারে মৌন ছাখো তুটি প্রাচীন পাথর
একটি নিটোল বৃত্ত গড়ে তোলে জলের ভিতর
আমাদের তুটি মুখ এক হল জলে।

হে আত্মপীড়ন, যুগ
তুফানে মাতন নেই
দালানকে ধরে রাখবে নেই সেই অটুট স্তম্ভও
ভাঙা সিঁড়ি স্তূপাকার, ইতস্তত মূর্তি, গাছ, স্মৃতি
পৃথিবীর কাছ থেকে সরে গেছে উদ্দেশ্য, আকাশ।

বীজের রোদসী কন্যা, শস্য,
আমরা অন্তিমে নিবেদিত
সে অন্তিম আদির সূচনা।

মুখে রাখ অনুরাগ, লবণাক্ত স্বাদ
আমিও তোমার ভাষা ছুয়ে মিলে বিস্তীর্ণ চেতনা
এক বাহু সমুদ্রকে অন্য বাহু পঙ্কিল কাদায়
যদিও দিয়েছি, শস্য, নিষ্পাপ প্রতিভা
বিপুল ধ্বংসের মধ্যে পরিচ্ছন্ন পতঙ্গ আমরা
আমাদের মৃদু আলো শূন্যে আলোড়িত
যখন আমার মধ্যে তুমি শুদ্ধ উচ্চারিত হও ॥

সেই মুখ

সারাক্ষণ রক্তে দোলে মুখ।

সে যেন সজল সন্ধ্যা বসে আছে পাহাড়চূড়ায়
অরণ্য গভীর হয় মুখ তুলে চেয়ে দেখে গাছ
চারিদিক প্রত্যাশায় রোমাঞ্চ উন্মুখ
সারাক্ষণ রক্তে দোলে মুখ।

সর্বাঙ্গে ধানের গন্ধ
কথা তার নদীর আওয়াজ
চোখ দুটি সান্ত্বনার

রূপে ঝরে নক্ষত্রের আলো
স্তিমিত বিদ্যুৎ হাসি কি মায়া ছড়ালো।

সে যেন ছড়িয়ে আছে মাটি নদী অন্ধকারময়
তার নামে মধ্য রাত্রি নির্বাক তন্ময়।

সে এক আশ্চর্য মুখ
প্রাণমূল ধরে টানে, পাঁজরে পাঁজরে
আছড়ায় ঘূর্ণিমার, ছিঁড়ে যায় শরীরের শিরা।

নামুক নামুক বজ্র
বন্ধ্যা মুখে করুক প্রহার,
অন্ধকারে ঊর্ধ্বমুখ আমি
সে রূপের আলো পড়ে আমার কপালে
গৌরীশৃঙ্গ জ্বলে।

আমার রক্তের স্রোতে
এক মুখ,—অপরূপ ;
জনম অবধি হায় দেখি তাকে
দৈন্যের চূড়ায়, দেখি স্বপ্নের চূড়ায়॥

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

(১৯২৫)

একটা দিনের শেষ

একটা দিন গেল
কাঁটার পথে হেঁটে, অনেক কাদা ঘেঁটে
একটা দিন গেল,

মত্ত বর্ষায়, ক্লান্ত রিক্‌সায়
একটা দিন গেল !

একটা দিন গেল
আকাশে মেঘ, আর হাজারো চিন্তার
একটা দিন গেল,
শ্রান্ত কেরানীর দু'চোখে বেঁধে তীর—
একটা দিন গেল !

একটা দিন যায়,
তারার আলো কই, চাঁদের গান কই
একটা দিন যায় !

মস্ত দেশটার তীব্র চীৎকার
একটা দিন যায় !

কৃষ্ণ ধর
(১৯২৬)

অনুতাপের প্রশ্নে

অনুতাপ যদি আসে কোনোদিন, কোনোদিন যদি
মনে হয়. এ আমার প্রতারণা, প্রেম নয়, তুমি
সব মনটুকু অনাবৃত করে যাকে চেয়েছিলে
সে শুধু মুখোশ পরে, উজ্জ্বল বাক্যের বিবিধার্থে
মিথ্যা এক প্রেমিকের অভিনয় করে গেল, তবে
বলো তুমি কোনোদিন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে শেষে
নিজেকেই নিহত করবার ইচ্ছা হবে না তোমার ?

কখনো হবে না, ঠিক জেনো, আমি কত যে কৃতজ্ঞ
এই বিস্মিত সময়টুকু ঘিরে কত স্বপ্ন, এই
রৌদ্রে ঘ্রাণ নিই, তুমি কতক্ষণ এসে বসে আছো!
আমাকে বিস্মিত করে যদি তুমি ফের কোনোদিন
নাই ডাকো, এই পরমাশ্চর্য দিন তবু তো আমার
হয়ে বলবে খোঁপাবাঁধা সুকেশী সন্ধ্যাকে, উজ্জ্বল
যুবক এক এসেছিল, উজ্জ্বলতর ভালবেসে ॥

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯২৬)

স্বীকৃতি

যে মেয়ে আমায় ছাড়া চেনে নাকো আর কাউকেই,
আমি তাকে ব'সে ভাবি ক'টি যে প্রহর পরপর।
সে আমায় জল দিলে ভাবি তৃষ্ণা পৃথিবীতে নেই ;
সে আমায় কথা দিলে ধ্বনি ওঠে গাছের মর্মর।

যে মেয়েকে আমি চিনি সর্বশেষ অধিকার নিয়ে,
সে আমার কথা ভেবে চুলবাঁধা শেষ করে নাকো।
আমি তার ভালোবাসা ভ'রে দেব বলো না কি দিয়ে
যে আমার হাত ধ'রে বলবেই : ওগো কথা রাখো।

আমি যে তাকেই চিনি যার ক্রোধে রৌদ্র ফাটে মাঠে,
যার মুখে হাসি দেখে নবীন বৈশাখও লজ্জিত,
তারই দুঃখে সূর্য বুঝি মাঝে মাঝে নামে লাল পাটে,
সে আমায় খোঁজে ব'লে ভিড়ে আমি হয়েছি স্বীকৃত ॥

রুডিন

এক

টিকটিকি গিরগিটি
হুজনেই এম.এ.বি.টি.
হাসে শুধু মিটিমিটি
ইংলিশে লেখে চিঠি।

হুই

রেল-লাইনে বেল পড়েছে মস্ত পাকাপাকা
তারই ওপর পড়ল এসে এঞ্জিনেরই চাকা
যেমনি পড়া শব্দে যেন এ্যাটম্‌বোমা হাঁকে
পাকাবেলের গন্ধে কি কেউ গাড়ির ভেতর থাকে।

তিন

কারজন নামে ছিল কম ক'রে চারজন
একজন বড়লাট, তিনজন টারজন॥

চার

হিটলার মুসলিনী তেনজিং নোরকে
নামগুলো শুনে কেউ যেতে পারে ভড়কে
ড্যানিয়াল ডিফো আর স্যামুয়েল জনসন
নাম হুটো ভাবলেই মাথা ঘোরে বন্‌বন্‌॥

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য
(১৯২৬)

পোড়া মাটি

এমনি করেই বছর বছরে ঘুরবে,
পুড়বে মাঠের সবুজ দুব্বো মাঠে
চণ্ড বোশেখে যেমন পুড়েছে পূর্বে।

কেন না পাপ সে তোমার আমার মনে,
বাপকে করে না কৃপা,
বৃথা বাপুজীর বাণী জ্বালো মণিদীপা,
কী ফল ফলবে শতপথ ব্রাহ্মণে।

এ সবে কলির সন্ধ্যা—শ্মশান জ্বলে,
আকাশে শকুন, রাত কাঁপে হরিবোলে ;
কান্নায় ভেঙে সেও তুমি আমি ভাসব
আজ নয় কাল—বাতাসে বিষের বাষ্প।

তবু তুমি বলো, পঁচিশে বোশেখ শুভ,
ঘরে শাঁখ, ভরো কর্পূর ধূপদীপে ;—
শত্রু সে আসে কখন পা টিপে টিপে
মরণ বিলোয় বিকিনি-ধুলোয় ধ্রুব।

এমনি করেই বছর বছরে ঘুরবে,
পুড়বে মাঠের সবুজ দুব্বো মাঠে—
এমন পোড়েনি পূর্বে॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯২৬)

অপরাজিতা

ব্যথার রাঙাজবা অপরাজিতা নীল যন্ত্রণার,
উদার শান্তির সন্ধ্যামণি আর জাগর রজনীর পলাশ ভোর,
রাতের তারা যত দু'হাতে-লুঠ-করা ফুলের ঝাড়
সকলি দেব আজ মৃত্যু ভুলে যাব দুহাতে তোর।

আমার বাঁচা-মরা আমার ভাঙা-গড়া
হাসি ও কান্নার জমানো তোড়া
দোলাবে নিদ্রাকে ভোলাবে রূঢ়তার কঠিন কোড়া।

সে যে একতারা বাজাই প্রেমের গান
বোশেখে শ্রাবণে হাটে-মাঠে গাঁয়ে পথে।
এ মাটি বাউল আমি বৈরাগী সেও তো প্রেমেরই টান,
সারা জীবনের নজরানা দিই রক্তিম ফারখতে।
রাতের আকাশে দৌলতখানা
সারা হৃদয়ের হে হাসনহানা
গুনে যাও আর বুনে বুনে যাও স্বপ্নের মসলিন—
সে তো ভোলে নাক এই ফণা-ধরা দিন।
আমি বৈশাখে খ্যাপা মাঠে আনি লাঙলের তোলপাড়
কবে হবে তার লক্ষ্মীবরণ নতুন লগন্-সার?
কেউটে-করাল বিজন দুপুরে প্রাবনের শাওনীয়া,
মড়কের মাঠে মৃত্যুকে ঘিরে অভিনব আহেরিয়া।
বোনা ও ভানায়, নীড়ে ও ডানায় তাকে বার বার চেনা,
তারই আঙিনায় বসাই সাঁঝের হেনা।

মণিমালা ধিকিধিকি বিষ জ্বালে তোমার দুপুর সব কালো হয়ে গেল,
মণিমালা ঢুলুঢুলু দুটি চোখে নেমেছে অকাল সন্ধ্যা হাজার বছর,
মণিমালা দিবা নিশা একাকার অন্ধ ক্রোধ পাতালের ভয়াল ছোবল।
পৃথিবী ভুলেছে বুঝি হয়তো অনেক রোজ দ্বীপে দ্বীপে ছড়ালো দুপুর।
আথিবিথি ছুটি আসি আজীবন আযৌবন করে যাই আকুলিবিকুলি,
আমিই ছিনিয়ে নেব কালকূট অজগর ফণার পাহাড় থেকে মণি,
সেই তো প্রেমের মণি—তারি আলো থমথমে অন্ধকার রেণু করে দেবে
তোমার বুকের কাছে চলে যাব ভেঙে ভেঙে জটেবুড়ি জটিল কুয়াশা।
তোমার প্রেমের স্বপ্নে আরেকবার উজ্জীবিত হবে এই জীবনের দীঘি
কহ্লারে কুমুদে আর মধুমত্ত ভৃঙ্গরোলে ঢেউ তুলে হবে ঝিকিমিকি।

'কাউয়া করে কল্‌মল্‌ কোকিলে দেবে ধ্বনি'
কার কন্যা জাগে গো কিসের আগমনী ?'
হাতের বাজু ঝলসে ওঠে রাঙা হাসির শাঁখা,
রৌদ্রমণি দুচোখ জ্বলে—উঠান ধানে ঢাকা।
কন্যা আসে নতুন দিন লাল সুরুষের টিপ,
পৌষ ফাগুনে মেলা আনবে সোনার জম্বুদ্বীপ
'কাউয়া করে কল্‌মল্‌ কোকিলে দেবে ধ্বনি'
হৃদয় করে হৃদয় পণ দিবস গুনি, গুনি।

কখনো গম্ভীরা কখনো গাজনের নাচনে মেতেছি
কখনো দম্ভের পাগলা হাতি নামে—সইলাম
দাঁতাল বরাহের মাতাল ব্যভিচার ফলায় গেঁথেছি
মহান মিছিলের রঙিন জিম্মাকে বইলাম।
জ্বালাও স্বপ্নের অমর দীপাধার
তোমার হাতছানি ভাঙুক কারাগার
আমার দেশজোড়া সোনার মন্দিরে খোল না নবদ্বার।
টিয়ার পালকের সবুজ শাড়ি পরো বকের পালকের মালা
দুহাতে তুলে দাও প্রাণের পাত্রকে মদির মহুয়ায় ঢালা—
তুমি যে কাঙালিনী গাছকে সখি বলে বেঁধেছ আঁধারের ঘর
ব্যথা ও বেদনার ঝাঁঝর করতালে ওঠাবে দীপকের ঝড়।

জেগে জেগে কারাকক্ষে, বক্সার পাহাড়চূড়ে দমদমার রক্তিম দালানে
ভোর থেকে সন্ধে-তক ভরে তোলা হৃৎপিণ্ড-দগ্ধ-করা ক্ষান্তিহীন গানে
তারি ডাক ভেসে আসে। তারি তো দুহাতে খোলা পৃথিবীর শেষ অভিধান।
সে যখন গান করে ফাল্গুনের আশালতা হাসি মুখে বলে তার নাম।
সমুদ্রের দোলনা থেকে দিগন্তের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আকাশের আঙিনাতে
মেঘের বিরাট শিশু লুফে নিলে নারিকেল বাহুকে বাড়িয়ে। সেই রাতে
রাঢ়ের বাউল মাঠে জাগে তার ঘূর্ণিত উল্লোল। স্বৈরিণী পদ্মার বানে
তরঙ্গিণী মাঝি বৌ তার কাছে শেখা সুরে সাড়া দেয় মাঝির আহ্বানে।

কখনো মৃত্যুর লিপি জীবনের সুতীব্র আলোয়, কিংবা জীবনের পাঠ
মৃত্যুর মশালে পড়ি। পৃথিবীর দিশে দিশে আনো শান্তিসন্ধ্যার ললাট
সহস্র বর্ষের শান্তি, বিষণ্ণ মর্মের শান্তি, আঙিনায় চাঁদিনী আলাপে
পরিক্লান্ত সৈনিকের বিধুর সীমান্তব্যথা তোমাতেই সুর হয়ে কাঁপে।

আমি সেই প্রগল্‌ভ কিশোর, তুচ্ছ করে মৃত্যু, কাঁটার সঙিন ক্ষত সবি,
হে নন্দিনী তোমারি করুণ হাতে তুলে দিই জীবনের এ রক্তকরবী ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

(১৯২৬-১৯৪৭)

আঠারো বছর বয়স

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টীমারের মতো চলে,

প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা.
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত, একে একে হয় জড়ো ;
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

সূচনা

ভারতবর্ষে পাথরের গুরুভার :
এ-হেন অবস্থাকেই পাষাণ বলো,
প্রস্তরীভূত দেশের নীরবতার
এক ফোঁটা নেই অশ্রুর সম্বলও।

অহল্যা হলো এই দেশ কোন পাপে
ক্ষুধার কান্না কঠিন পাথরে ঢাকা,
কোন সাড়া নেই আগুনের উত্তাপে
এ নৈঃশব্দ্য ভেঙেছে কালের চাকা।

ভারতবর্ষ, কার প্রতীক্ষা করো,
কান পেতে কার শুনছো পদধ্বনি ?
বিদ্রোহে হবে পাথরেরা থরোথরো,
কবে দেখা দেবে লক্ষ প্রাণের খনি ?

ভারতী, তোমার অহল্যা-রূপ চিনি
রামের প্রতীক্ষাতেই কাটাও কাল,
যদি তুমি পায়ে বাজাও ও-কিঙ্কিণী,
তবে জানি বেজে উঠবেই কঙ্কাল।

কত বসন্ত গিয়েছে অহল্যা গো—
জীবনে ব্যর্থ তুমি তবু বার বার,
দ্বারে বসন্ত একবার শুধু জাগো
দু-হাতে সরাও পাষাণের গুরু ভার।

অহল্যা-দেশ, তোমার মুখের ভাষা
অনুচ্চারিত, তবু অধৈর্যে ভরা ;
পাষাণ ছদ্মবেশকে ছেঁড়ার আশা,
ক্রমশ তোমার হৃদয় পাগল-করা।

ভারতবর্ষ, তন্দ্রা ক্রমশ ক্ষয়
অহল্যা, আজ শাপমোচনের দিন ;
তুষার-জনতা বুঝি জাগ্রত হয়
গা-ছাড়া দেবার প্রস্তাব দ্বিধাহীন।

অহল্যা, আজ কাঁপে কী পাষাণকায়
রোমাঞ্চ লাগে পাথরের প্রত্যঙ্গে ;
রামের পাদস্পর্শ কী লাগে গায় ?
অহল্যা, জেনো,—আমরা তোমার সঙ্গে॥

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান :
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চ'লে যেতে হবে আমাদের।
চ'লে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
ক'রে যাবো আশীর্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস॥

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ, বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে।
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা।
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে
ফোটাবো বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে, দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়,
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাবো বৃহতের দলে
জয়ধ্বনি কিশলয়ে, সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।

ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই জানি আমি ভাবী বনস্পতি
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সে দিন ছায়ায় এসো: হানো যদি কঠিন কুঠারে
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেবো বারে বারে।
ফল দেবো, ফুল দেবো, দেবো আমি পাখির কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥

চিল

পথ চ'লতে চ'লতে হঠাৎ দেখলাম :
ফুটপাতে এক মরা চিল!
চমকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে
লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ,
যার শ্যেন-দৃষ্টিতে কেবল ছিল
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি —
তাকে দেখলাম ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।
গম্বুজ-শিখরে বাস করতো এই চিল,
নিজেকে জাহির করতো সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে ;
হালকা হাওয়ার ডানা মেলে দিতো আকাশের নীলে
অনেককে ছাড়িয়ে, একক :
পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে।
অনেকে আজ নিরাপদ ;
নিরাপদ ইঁদুরছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ—কারণ সে আজ মৃত।
আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারবার,
ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও পড়ে রইলো ফুটপাতে,

শুক্‌নো, শীতল, বিকৃত দেহে।
হাতে যাদের ছিলো প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে-ধরা
তারা আজ এগিয়ে গেলো নির্ভয়ে,
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশ-চ্যুত এক উদ্ধত চিলকে ॥

সুশীলকুমার গুপ্ত

(১৯২৬)

রাজহাঁস

তুমি এক রাজহাঁস, খেলা ক'রে যাও সারাদিন
হৃদয়ের দুরন্ত দীঘিতে
সূর্যসখী পদ্মের সভায়,
স্বপ্নের আলেখ্য আঁকো শুক্তিশুভ্র পাখার তুলিতে।
তোমার বুকের উষ্ণ ঘ্রাণে
বিবশ রূপালি ঢেউ জড়ায় শ্যামল তন্বী তীর,
ফেনপুঞ্জ অবাধ্য রঙিন
প্রজাপতি হ'য়ে ফেরে বুকে নিয়ে রৌদ্র ফুলরেণু ;
লীলালাস্য কলরবে ভ'রে তোল জলের শরীর।

তারপর সন্ধ্যা হ'লে চলে যাও। এ-দীঘি একাকী
তোমার স্মৃতিকে নিয়ে মুখ গুঁজে রাত্রির বালিশে
পড়ে থাকে। বুকে তার দুটি
ধবল পালক, ছিন্নপত্র লেখা, করুণ জোনাকি।
ভাবে—এ কী রূঢ় পরিহাস!
আমাকে কাঁদাবে একা—এই শুধু তোমার উল্লাস ?

অসীম রায়

(১৯২৭)

আমি ভাবতেই পারি না

আমি ভাবতেই পারি না আমি ভাবতেই পারি না কেন প্রশান্তির
এই নিঃশ্বাস
এখনো ক্ষীণ নয়, এখনো চন্‌মনে বাঁচার অভিযোগে শক্ত
মনের বৈরাগী, আকাশ ভাঙে যদি বাতাস কথা বলে ফিস্‌ফাস্‌
বনের সীমা যদি আলোতে জলজ্বলে আঁধার হোল যদি আরক্ত।

আমি ভাবতেই পারি না আমি ভাবতেই পারি না কেন নদীরা
হবে না গিয়ে সমুদ্র
দীঘির বেনো জলে সময় বেয়ে বেয়ে হৃদয় ঢুলুঢুলু শান্ত
দিবস নিশিগুলো সাজাবে থরে থরে, পরাণ-পিপাসা রবে অশূদ্র
দুহাতে কাদা-মাখা দুপায়ে ধুলো-ঢাকা জীবন যখন অক্লান্ত।

আমি ভাবতেই পারি না আমি ভাবতেই পারি না কেন মানুষ
হবে না আজ ইস্পাত
ধারাল বিদ্যুতে জ্বালিয়ে যৌবন বজ্রের মহাশব্দে
ভাঙবে ভাঙবে না পাহাড়পুরী এই ঘুমের মহা অভিসম্পাত
বাঁচবে বাঁচবে না নতুন করে ফের বাঁচার নতুন এই অব্দে॥

সার্থক জনম মাগো

সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এদেশে যেই শুনি
অমনি অন্ধ আর্তনাদে বিদ্রূপের সহস্র চাবুক
পিঠে বুকে মুখে পড়ে, দু-চোখের ব্যগ্র কালো মণি

নিভে যায়, মজে মুগ্ধ তালদীঘি, পূর্ণিমার বুক
ছিঁড়ে ফেলে অকস্মাৎ ক্ষিপ্র কোন শব্দের বাঘিনী ;
মাগো এই দেশ নাকি এরা নাকি মানুষের মুখ
অসহায় শেয়ালদার উদ্বাস্তুর অন্তিম কাহিনী
এই দেশ, এ যে মৃত্যু, তিলে তিলে মৃত্যুর অসুখ।

হায় রে উল্লাসকর আজো নাকি ফাঁসির মঞ্চতে
কণ্ঠে তোর মর্মরিত এদেশের বিস্তীর্ণ আকাশ
অঙ্গ নাকি মুগ্ধ করে চাঁদিনীর উন্মনা আবেশ
এখনো গানের ঝড় সঙ্গী সব পারমিট চাকরিতে
ব্যস্ত, শুধু লক্ষ্য আজ একমাত্র অর্থের প্রয়াস ;
সত্যই হে সেলুকাস বিচিত্র বিচিত্র এই দেশ ॥

দুর্গাদাস সরকার
(১৯২৭)

নেপথ্য থেকে

জাহাজে যে কয়লা ভাঙত অকস্মাৎ কাল গেছে মারা।
ডেকের ওপরে পোড়া ছন্নছাড়া মুখ যায় না চেনা,
দেখেও কে ভাবতে পারে এই সেই ইব্রাহিম শেখ।
দুবেলা যে এসে বসত, গল্প করত, সমুদ্রের ফেনা
মুখে ঘষে কালি মুছত, ছিল যার কিছুটা বিবেক,
সবাই ঘুমোলে পর রাত জেগে যে দিত পাহারা,
পাটাতনে অঙ্ক কষত কালি দিয়ে—দেশে কত দেনা,
দাঁতে ছিঁড়ত বাসি রুটি—আজ সে-ই মানুষ আরেক !

সমুদ্রের জলের গভীরে হবে কবর যদিও,
কালো শার্ট টানবে মাছে, হাঙরে লুঙিটা খাবে ছিঁড়ে,
তার মাংসে ভোজ দেবে সিন্ধুশঙ্খ সাগরের তীরে,
অস্থিগুলো ভাসবে তবু। জাভা-চীন-মালয়-বর্ণিয়ো
ঘুরে-ফিরে মানুষের চিন্তায় জড়াবে। তারপর
হা-হা করে হাসবে শুধু আমাদের অস্থির ভেতর ॥

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

(১৯২৭)

জন্ম-মৃত্যু, এই প্রজনন

বমনে বিকৃত মুখ, সারাদেহে কলঙ্কের দাগ—
কী করে দাঁড়াবো তার কাছে ?
আমার এ ঘৃণ্য পশুটাকে
আমি যত ঘৃণা করি, তত ঘৃণা মানুষে করে না ;
সমগ্র অস্তিত্ব তার ভূতগ্রস্ত বিকারের ঘোরে
ইতর সুখের এক গোপন বিবর ছাড়া আর কিছু জানেনি, জানে না।

এই দিয়ে ছোঁয়া যায় ধ্রুবতারকার দীপ্তি—প্রেম ?
অনুভব করা যায় কুমারীর মনের আহ্লাদ
হৃদয় ছাপিয়ে ওঠে স্বর্গীয় যে-দানে ?
যত স্বপ্ন-সাধ
কঠিন শায়ক-বেঁধা তীর্থগামী বলাকার মতো
চক্রবালে পাক খেয়ে মুখ গুঁজে মাটিতে লুটায় !
চোখে তার টলোমলো পদ্ম জাগে মানস-হ্রদের
যূথভ্রষ্ট বেদনায় নীল ;

রক্তাক্ত ব্যাদিত মুখে আমি বন্য কুকুরের মতো
ছেঁড়া পালকের ভাঁজে কোমল মাংসের স্বাদে মজে
স্বর্গের দোরের কাছে বেত্রাহত, আর্ত চেয়ে আছি!
আমি আর সেই পাখি
দুজনেরই দীর্ণ বুকে নষ্ট-নীড় স্মৃতি।

ভোরের আশ্চর্য লগ্নে কখন যে ফোটে পারিজাত—
ফুল-পাখি-পতঙ্গেরা সারিবদ্ধ, প্রথম অগ্নির
বন্দনায় নতজানু, অন্য এক জন্মের প্রস্তুতি
প্রত্যহের পুরানো এ পৃথিবীকে করে গর্ভবতী,
ঘোমটার ধনুকে-টানা পিঠ তার নতুন মায়ের
লজ্জায় কখন কাঁপে!—সব দূর স্মৃতি!

বৈশাখের পুণ্য ফুল, সহোদরা অমল নীলিমা,
মাঠের সবুজে ক্ষত-বিক্ষত এ হৃদয় বিছিয়ে
বারবার বলি তাই, 'শুদ্ধ করো, শুদ্ধ করে নাও'—
জাতক-লগ্নের সেই পবিত্র অগ্নির
স্পর্শ দাও আমার কপালে;
দাও সেই পাখা দাও, স্বর্ণবর্ণ বিহঙ্গ-যমজ,
হে উড্ডীন, হে আকাশচারী!

আমার প্রার্থনা যত নিরুত্তর দেওয়ালে দেওয়ালে
প্রতিহত হয়ে ফেরে; নিজেকে নিজেরি ছায়া যেন
হাত ধরে নিয়ে যায় সন্ধ্যার বীভৎস গলি পথে
মাদক-উল্লাসে যেন নরকের সব কটি দ্বার
সেখানে কে দেয় খুলে; নগ্ন-দেহে হুমড়ি খায় মাংস-লুব্ধ একপাল পশু,
হয়তো মানুষ ছিল গতজন্মে—আজ তার ছায়া।
স্খলিত গলায় তীব্র হেঁকে উঠি—"আমাকে ফেরাও,
নরক কী বীভৎসতর এ পঙ্কিল শহরের চেয়ে?"
হেসেছে এ প্রশ্ন শুনে ছায়ামূর্তি প্রেত অনুচর।

আবর্ত-কুটিল ক্ষিপ্ত ভোগবতী পাতালের নদী,
তোমার গভীরে আমি মজ্জমান হয়ে যেতে যেতে
প্রাণপণে হাত তুলে শুদ্ধ সেই প্রথম অগ্নিকে
জন্ম-শোধ একবার স্পর্শ করে যাব ॥

রুপালি মাছ

তুমি যেন এক রুপালি মাছ
চারিদিকে জল সুশীতল,
জলধারা যেন স্বচ্ছ কাঁচ
তাই তুমি সুখে রুপালি মাছ
জলকেলি কর অবিরল।

আমি ধরে রাখি বুকে তোমার
ছবিটি মনের আয়নায় ;
কত যে খাম্‌কা খুশি তোমার
হিজিবিজি ছবি বুকে আমার
আঁকে সাত-রঙা পাখনায়।

যাব আমি যাব তোমার কাছে
কোনো আমিষাশী লোভে না ;
ব্যাধিত যুগের যে স্নায়ু-জ্বর
বিকল করেছে গ্রাম-নগর,
সে হাত তোমাকে ছোঁবে না।

কিছু শীতলতা ভিক্ষা চাই
গভীর জলের শান্তির ;
এই চেতনার দুঃস্থতার
ব্যাধি হতে চাই মুক্তি, আর
অবসর চাই ক্লান্তির।

তোমাকে ঘিরে হে রুপালি মাছ
হতে চাই জল, সুশীতল—
জলধারা যেন স্বচ্ছ কাঁচ :
তুমি এই বুকে রুপালি মাছ
খেলা করে যাবে অবিরল ॥

রাজলক্ষ্মী দেবী

(১৯২৭)

এখনকার কবিতা

এক

হাসির ভিখারী আমি—নুয়ে-পড়া, ক্লান্ত মন নিয়ে
তাই ছুটে-ছুটে আসি। কতো কথা বলি যে বানিয়ে,
—কোমল আঙুলে ছুঁই—কালো চুলে দুই ঠোঁট গুঁজে
মৃত্যুকে দুহাতে যুঝি। স্নান করি চুমোর সবুজে।
তোমার হাসিতে বাঁচি।

কতো যে বেদনা, আত্মা জানে—
নাই-বা জানলে তুমি। কান্নার চেয়ো না কোনো মানে
উজ্জ্বল রৌদ্রের মতো হাসি চাই। তাই নিয়ে আসা
সাত সমুদ্রের প্রীতি—ঘুম-ভাঙা স্পর্শের কুয়াশা।

দুই

ভালোবাসি ?—হয়তো বা তোমাকেই আমি ভালোবাসি
তা নইলে এ-কুটিরে, এ-উনুনে আমার কি কাজ ?

সন্দেহ করো না তুমি,—এ হৃদয় হবে না সন্ন্যাসী।
—কাল সে বানাবে বসে, ভেঙে যা ছড়িয়ে দিলো আজ।

এ সমুদ্রে ঢেউ নেই। জানলায় টুকরো আকাশ
কতোটুকু! তবু মন এখানেও বাঁচে—কথা বলে।
সামান্যের ধূপে জলে অসামান্য পাওয়ার সুবাস
নিঃশব্দ আমার ঘরে। দোলনায় ছোটো শিশু দোলে।

তিন

এই তো বসন্ত, প্রিয়তম। সারা বছরের দেনা
একটি ফুলের অর্ঘ্যে শুধবে সে—কিছু শুধাবে না।
পিছনে চেয়ো না ফিরে। সেখানে মেঘলা দিনে, রোদে,
পূর্ণিমায়, অন্ধকারে—কী দেখাবে? জীবনের হ্রদে
কতো জল কি চঞ্চল! অঞ্জলিতে যা ওঠাবে, তার
রূপ নেই, মান নেই। মানে আছে এই মোহনার!
এ মিলন—এ-সংগম—এতে আছে সমুদ্রের স্বাদ।
পিছনের কথা তুলে আজকে কি করবে বিবাদ?

চার

যে-রাত্রিতে তুমি নেই। আর সব আছে।
আছে বই নির্জন ঘণ্টার সঙ্গী। জানালার ঘষা কাঁচে
আলোর নিস্তাপ হাসি। ড্রেসিং-টেবিলে আয়নায়
যতবার চেয়ে দেখি—ক্লান্ত চোখে মেয়েটি তাকায়।
সেলায়ে মূর্ছিত সূচী। খোকাখুকু ঘুমের অতলে।
কালের উদ্বিগ্ন বুকে টিক্‌টিক্ পেণ্ডুলম দোলে।

সব আছে। তবু যেন কিছু নেই। ছেয়ে সারা মন
একটি উৎকণ্ঠা শুধু—ঘণ্টি বেজে উঠবে কখন?

লোকনাথ ভট্টাচার্য

(১৯২৭)

হরিণীকে

সৃষ্টির অন্ধকার কক্ষে অকস্মাতের মাতাল হাওয়া দরজা ভেঙে ঢোকাল যখন, হয়তো থাকলে দেখতে পারতাম ফুল ফুটছে।

পারলাম না থাকতে আরো কিছুক্ষণ, নিশ্বাস-বন্ধ-হ'য়ে-আসা মুহূর্তে, অনুভবে আমার লাগল রুদ্রের ধ্যান, তার মুদ্রিত রক্তাক্ত নয়ন।

তাই পালালাম, চাইলাম গোধূলির ধূসর অবলুপ্ত প্রান্তরে হরিণের বেগ, তার পায়ে-পায়ে উঠবে সময়, পড়বে সময়, যে-সময় ছুটবে।

তাই খুঁজে পেতে আমাকে আবার, তুমি যখন পাড়ি দেবে দুস্তর পারাবার, পাবে আমাকে এইখানে, এই ঝরা-সময় মরা-সময় মরুর মাঝখানে, পায়ে-পায়ের গতিতে—

নয় গতির অতীতে, নয় ফুল ফোটায়, নয় সৃষ্টির অন্ধকার কক্ষে।

আমি যে পারিনি থাকতে···আমি রইলাম যেখানে ছিলাম সেই আমাদের শেষ মিলনের লগ্নে, সেই তুচ্ছতার স্তূপের বাঁ পাশে, পরিচিত চলার হাওয়ায়।

নয় সে-হাওয়া মাতাল, অকস্মাতের, দরজা-ভাঙা।

তুমি আমায় পাবে···

বলতে হবে কেন এলাম ?

অরবিন্দ গুহ
(১৯২৮)

জলতরঙ্গ

ভালোবেসেছিলি নদীকে কিন্তু নদী
তোকে ভাসালো না জলে ;
এ-ভালোবাসায় হলো না সপ্তপদী
আলোকিত কোলাহলে।
তীরের বালিতে মত্ত ঘূর্ণবায়ু
দিনে-দিনে কাড়ে নায়িকার পরমায়ু।
মুখ রেখেছিলি নদীর নীলাঞ্চলে
উধাও আকাশতলে।
প্রেম নিবেদন করেছিলি যৌবনে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মুখোমুখি ;
রূপসুন্দর উদার উচ্চারণে
তোর ভাষা ছিলো সুখী।
হৃদয় বাদানুবাদে ক্ষত-বিক্ষত
সকল কালের সব প্রেমিকের মতো ;
তুই ভেবেছিলি নিজেকে প্রথমাগত
স্পর্শের নির্জনে।
জানি, কয়েকটি কটাক্ষ অনুভবে
এখনো প্রজ্জ্বলিত ;
সেই অনুভব বসন্ত-উৎসবে
পলাশে সমর্পিত।
জলের ছলনা ঢেকে রাখে ভালোবাসা,
পলাশ ঢাকেনি তোর রক্তের ভাষা ;
এই পলাশের দুঃসাহসেই হবে
সূর্য অস্তমিত ॥

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

(১৯২৮)

মালয় : ল্যাণ্ডস্কেপ

জোহোর

বন্দী পাহাড়। নিস্তরঙ্গ জল।
অজগর পথ। পৃথিবী অসমতল।
অন্ধ সবুজ। সাদা রবারের বন।
হলুদ রোদের উজ্জ্বল উল্লাসে—
পিঙ্গল মাটি আনগ্ন হয়ে আসে,
তখনই তাকাই—আকাশের বুক চিরে
থমথমে মেঘ ঢেকেছে অগ্নিকোণ।

পাহাং রোড

বৃষ্টি, বৃষ্টি, ক্ষুব্ধ জলের স্বর।
নত অরণ্য। পাহাড় নিরুত্তর
আকাশ কোথায়? দিগন্ত ধোঁয়া ধোঁয়া…
ধূপছায়া ঢাকে মাটির সবুজ রোঁয়া।
উপত্যকায় কুয়াশার সরোবর।

মুয়ার : মুয়ার ছাড়িয়ে

নদী এখানে সাগর মেশে
পাহাড় মেশে বনে—
আকাশ মেশে অন্ধকার মেঘের নির্জনে।
স্মৃতিরা ধু-ধু স্বপ্নে মেশে
কুয়াশা কালো হ্রদে—
সঙ্গীহীন শূন্যতায় অশ্রু মেশে মদে॥

শান্তিকুমার ঘোষ

(১৯২৮)

আটত্রিশডিগ্রি অক্ষরেখা

বিপরীত দিকে তবু সমান করুণ মুখ শিবিরে সৈনিক।
রাত্রির তিমির ছিঁড়ে অনেক প্রার্থিত সেই আসেনি পথিক :
নিঃশব্দ তুষার পড়ে, নির্ধূম পরিখা পারে বিরতির আলো
প্রচ্ছন্ন আশার মতো ; বাকি সব অন্ধ নীল মৃত্যুহিম কালো

মানবপুত্রের নয়। শতাব্দীর বাষ্প জমে অসংখ্য হৃদয়ে
মুখোমুখি ছাখে চেয়ে সমুদ্রের মতো দোলে দুঃখ মানবিক ॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

(১৯২৮)

উত্তরঅয়শ্চক্রে, প্রদক্ষিণ

আমরা ঘুরতে ঘুরতে কখন, উত্তরায়ণের
দেউড়িতে এসে পড়লাম
ভুবনডাঙার মাটি, চাঙর-মাটি, ধুলো, গেরুয়া
থেকে থেকে লাল ছোপ, গেরুয়া

গেরুয়া টানে টানে একটা বিরাট, দিগন্ত-প্রয়াসী অস্ত, বিদায়
নিচু বাংলার আতুর সন্ধ্যা, অবিলোপী
খোয়াইয়ের পাটাতনের উপর বিচ্ছিন্ন, একা
প্রবল মূর্ছায় মুক্ত-বন্ধ
প্রকৃতি

মুক্ত
অন্তর-চেতনা
বন্ধ
আমার মধ্যে সমস্ত বহির্দেশ
অথবা বহিঃচরাচর বিন্যস্ত, বাস্তব, যেখানে
তোমার আমার সাযুজ্য, সত্তা
তারা
কত তারা তব আকাশে
আকাশের খচিতপ্রান্তর জুড়ে জুড়ে কতযুগ
নির্নিমেষ, তারা
আমআমলকী-সপ্তপর্ণীর চৈতন্যপ্রহর
চলে বাউল বীথিকা,—উদয়াস্ত গান
আমার মিলন লাগি
তুমি
তোমার বিপুল জাগরণ
আনন্দরূপমমৃতম্
অয়শ্চক্রে প্রদক্ষিণের পর, উত্তরাবর্তকক্ষে
অনুস্বর, বিন্দু
যদ্বিভাতি
দিঙ্‌মণ্ডল প্রসারিত, প্রসারিত, ঘূর্ণিত বাষ্পেমেঘে
যদ্বিভাতি

তোমার বিপুল জাগরণের মধ্যে, আমার
প্রবল মূর্ছা
প্রকৃতি, অপ্রাকৃত সুন্দর
বিপরীত ও সুন্দর
আনন্দরূপম্
নাকি আমাদের বহনের ক্লান্ত হাত, ক্লান্ত হাত
বহনের ক্লান্ত হাত, অমৃতকুম্ভ
ভেঙে পড়ে, ছত্রখান

কোপাইয়ের পাড়, কেয়াকাশের ডাক, গেরীমাটির লোহিতরক্ততা
যেখানে, তোমার

বিচিত্র আনন্দ, বাজে ॥

আগুন আমার ভাই

সময়ের ডানার ভিতরে
তুমি ছিলে চলচপল অগ্নি
সেই ডানা ঘ্রাণ লেগে পুড়ে গেলে, পাবক
তোমার উলঙ্গ আত্মা চিনি

তোমার বর্বর আত্মা
যা রইল সভ্যতার আগুয়ান মূলে
কিম্বা যা সভ্যবর্বরতা ভেদ করে বিশুদ্ধ মৌলিক অন্তঃপুরে
মানুষের হৃদয়কে পুড়লে

অরণির থেকে আমি কোন আলো জ্বেলে নিয়ে
গুহা থেকে গুহার বিবরে ফিরে, ফের
অবারিত গুহায়
সমাহিতি চেয়ে নয়, সমাধান নিরর্থক চেয়ে
হয়ে গেছি চিত্ররূপময়

বাইসন-তিমিরপীঠ পার হয়ে, দ্রুত হরিণীর
পলায়নপর দ্যুতি পেলে
শেষ চিত্রকল্পে কিম্বা বারবার প্রথম প্রতীকে
অতিকায় প্রশ্নে ছায়া ফেলে
আমিই কী রয়ে যাব চিরকাল শিকারীকে ছেড়ে, সেই শিকারের অন্তিম
প্রশ্নের বাহক

দশহাজার হাজার বছরের তাম্রপ্রস্তর সব নির্বিবেকে ভোগ করে এসে
হিমের বলয় ভেঙে বারবার, হিমেরই বলয়ে পলাতক

তুমি স্বত্বহীন সত্তা তবু দীপ্র-বাত্যঅগ্নি, অন্ত্যজ নায়ক

'মা নিষাদ' বলে আমি প্রথম আদি কোন বাণী
উদ্গাতার মতো
শুদ্ধ উচ্চারণে ভ'রে পৃথিবীর দিগন্তকে একবারও শুনিয়েছি, এমনকি
সে আদেশ স্মরণরহিত

তমসার থেকে, কোন তমসায় আমি
কোন তমসায় আমি
নেমে
জলে জ্বালি হৃদয়ের শোক

সময়ের কোন ডানা গরুড়ের চেয়ে বৃদ্ধ, পরিণামহীন, ভ্রাম্য,
অনুতাপকামী
আমিই দাহ্য আর আমিই সে একক দাহক ॥

শামসুর রহমান

(১৯২৯)

পিতা

প্রাণে গেঁথে সূর্যমুখী-উন্মুখতা খুঁজি আজো তাঁকে
সর্বত্র অক্লান্ত শ্রমে। স্বপ্নের মৃণালে মুখ তাঁর
জ্যোতির্ময় কল্যাণের মতো ফুটে অভ্র-শুভ্রতার
অতল সমুদ্রে ডোবে—খুঁজি আজো বিদেহী পিতাকে।

অজ্ঞাত, বিরূপ এই রুক্ষ দেশে মৌন বাসনাকে
নক্ষত্রের মতো জ্বেলে চাই তাঁকে দুর্নিবার
আতঙ্কের মুখোমুখি, যেমন সে মৃগতৃষ্ণিকার
নিঃসঙ্গ পথিক চায় পান্থপাদপের মমতাকে।

তিনি নন জন্মদাতা, অথচ তাঁকেই পিতা বলে
জেনেছি আজন্ম তাই মুমুক্ষু কালের অন্তরাগে
সমর্পিত তাঁরই কাছে। জীবনের সব মধুরিমা
করেছি নিঃশেষ শুধু অশেষ সম্মানে জ্বলে জ্বলে।
তিনি নন বিধাতা অথচ ব্যাপ্ত সত্তার পরাগে
তবে কি উপমা তাঁর চৈতন্যের ভাস্বর নীলিমা ?

সুনীলকুমার নন্দী

(১৯৩০)

কালের পুতুল

ওরে ও নির্বোধ শিল্পী, গড়তে এই কালের প্রতিমা
সমস্ত যৌবন দিলি, দিলি তোর প্রাণের রক্তিমা

শব্দের পাথর ভাঙতে, বিড়ম্বিত ভাগ্যের ললাট
বিদীর্ণ, শোণিতে স্বেদে একাকার উদ্‌ভ্রান্ত সম্রাট

নির্বিকার, খুঁজে ফেরে বিসর্পিল নৈরাজ্যে সুন্দর
পাথরে আদল আনতে, ফুটে ওঠে বীভৎস বর্বর—

অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে, দস্যু হস্তে কেড়ে নেয় স্বাস্থ্যের নীলিমা
যদিই বানাতে চাস, পুতুল বানারে শিল্পী, হবে না প্রতিমা ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩২)

পাটুলি গাঁয়ের মুখ

শিয়রে তার বিপুল কালপুরুষ
টেমি-জ্বালানো তারার রাত্রি ঘরে,
রৌদ্রবেলার পেশল পোক্ত মানুষ
ঠিকানাহীন চৈত্রশেষের ঝড়ে।

মাঠের সাপ খোলস রেখে গেল
দূরের দিকে শীতের পায়ে হাঁটা,
অন্ধকারেই রিক্ত জারুল এলো
শরীর ভরে জোনাকি ফুল-কাঁটা।

কাস্তে বানায় সুজন স্বামী তার
বিজন বুকে দামাল রক্তে টানে,
গর্ভে দেবে জাতক-যন্ত্রণার
আরেক শস্য জনমজয়ী গানে॥

আলোক সরকার

(১৯৩২)

কিশোর কবি

ভালোবাসো অনেকবারের দেখা ছবি।
কতো বছর হয়ে গেলো
পুরোনো ছবি ভালোবাসো কিশোর কবি।

সাতরঙের জানলা হাজার আকাশ
আবার কাছে এলো যেন
বৃষ্টি-পড়া দিনের শ্যামল মমতায়।

কিন্তু স্রোত চেয়েছিলে তুমি,
ভালোলাগা তবু অন্য দ্বিতীয় যন্ত্রণায়
অপর ক্লান্ত দু-চোখ মেলো।
অন্তরালের প্রেমিকজন গোপন রাখে নিহিত পটভূমি
ভেবেছিলে সেখানে তুমি স্বভাবী পরিবর্তনের।
পুরোনো রঙ কেন আবার ভালবাসলে কবি!

সময় দেখো সরল ডানায় উড়ে
কাছে যারা ছিল তারা শান্ত ইতিকথায়
রেখেছে, আজ একলা অচেনা দেশ।
তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত নিয়মে, তারা অপর মালা গলায়
তুমি একা, চেনাছবির ভালোবাসায় দূরে
কাকে রাখো ; যেন রাখো কালো মেঘের একাগ্র নির্দেশ
অসীম তিরস্কারে। তুমি যুবক হবে কবে কিশোর কবি॥

কবিতা সিংহ

(১৯৩২)

আমার প্রিয় কবি

বড় বেশি বেঁচে আছ প্রাণ-মঞ্চে প্রধান নায়ক,
কলমের শল্যে করো নিজের স্ফোটকে সূচীমুখ,
পুনর্বার প্রাণে বেঁধে যন্ত্রণায় বিষাক্ত শায়ক।

তোমার কবিতা পড়ি, রক্ত আর অশ্রু মাখামাখি
বেদনা বাসনা কাঁপে অশ্বত্থের লাল স্বচ্ছ পাতা,
তোমার সঙ্কেত ধরে গোপন ঘরের ছক আঁকি।

মুঠো ক'রে রক্ত ছোঁড়ো, বাসনা-আবির, তবে আছ,
তোমার নায়ক সব আত্মঘাতী শেষ পরিচ্ছেদে,
মৃত্যুকে সঞ্চারী ক'রে, কোনক্রমে বিষমুক্ত, বাঁচো॥

তরুণ সান্যাল

(১৯৩২)

সৃষ্টি

এই তো আমার হাত, ধূলিরুক্ষ, কুণ্ঠায় ধূসর
এই তো অনিদ্র রাত্রি ভাঙাগড়া সৃষ্টির বিলাস,
রহস্যের সীমাহীন সান্ত্বনায় রুক্ষ অনুর্বর
প্রাণের মৃত্তিকামূলে লিখে রাখা অন্য ইতিহাস
এই তো আমার মৌন নীলকণ্ঠ রাত্রির কবিতা

এ-হাতে সৃষ্টির ব্রতে লিখি মুছি মুক্তির প্রতিমা

যে আমি বিকীর্ণ আর্তি—অস্তরেখা প্রবাল সবিতা
যে আমি নিস্পন্দ দীপ্তি সন্ধ্যামৌন নক্ষত্রে নীলিমা
সে আমাকে দিন নয়, রাত্রি নয়—প্রতিটি প্রহরে
অভিশাপে দীর্ণ করে যন্ত্রণার অদৃশ্য দুর্বাসা
ছিন্নভিন্ন পরমাণু তীব্রদাহে অশ্রুর অক্ষরে
ভাঙে গড়ে স্বয়ংবরা তিলোত্তমা সৃষ্টির দুরাশা

অদৃশ্য আবর্ত থেকে সে আমার কোনো মুক্তি নেই

তবুও আমার হাত স্রষ্টার হাতের মতো জ্বলে
তবুও আমিই যেন প্রাত্যহিক কর্মস্রোতে দিই
আমার সুতীব্র তীক্ষ্ণ বিষকন্যা সৃষ্টির অতলে
মুক্তির আশ্চর্য বাণী, জীবনের ক্লান্ত অনুর্বর
মৃত্তিকার প্রাণকেন্দ্রে জন্মের নতুন ইচ্ছা টলে

এই তো আমার হাত ধূলিরুক্ষ, কুণ্ঠায় ধূসর
আমার এ হাত ছাড়া সান্ত্বনার অন্য কিছু নেই ॥

যুগান্তর চক্রবর্তী

(১৯৫২)

দর্পণ, বয়স বাড়ছে

দর্পণ, বয়স বাড়ছে, প্রতিবিম্ব কিছু ধরছো না।
না প্রেম, না পরিণতি, আত্মা কিংবা আত্মমগ্ন পাপ,
স্মৃতি শুধু ঝুলি ভরছে পোকা-কাটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ,
প্রাচীন তোরঙ্গে কিছু ছিন্নপত্র, ঊর্ণাজাল বোনা
কিছু আত্মপ্রতিকৃতি। তুমি তারই নির্বিরোধী কোণা
খুপচি জুড়ে বড় তৃপ্ত, কানাচক্ষু লণ্ঠনের তাপ
প্রণয়ী পোকার দৃশ্যে শাদা দেয়ালের পরিমাপ
যতটুকু ধরে, তুমি তারই চিত্রে অর্পিত। দেখছো না—
দর্পণ, বয়স বাড়ছে, শরীর ধরছে না, রুক্ষ মুখ
চায় লক্ষ কোটি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের জটিলতা,
হাড়ের কাঠামো চায় প্রতিমার রক্ত-মাংস, কথা
খোঁজে সর্বাঙ্গের ব্যবহার, তুমি কবে চূর্ণ বুক

পেতে তার রূপ ধরবে, কবে তুমি বিশাল নগ্নতা
নিয়ে হবে শুদ্ধ, মুছবে প্রত্যহের আয়ুর অসুখ ॥

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

(১৯৩২)

অজ্ঞাতবাসের গান

দ্রৌপদীর শাড়ি-ভাঁজ যত খোলে অন্য রং দেখি বহুতর
পাটে পাটে ; জীবনের সব ভাঁজ খুলে খুলে দেখ যদি, তবে
আরো বহু নীল-রং প্রেক্ষণ প্রশ্রয়ে আশ্চর্য স্বপ্নেতে মন
মন হবে—শিহরিত শিথিল জীবনে তারি ছায়া থরোথরো।

এ ব্যথার দুর্যোধন যত দেয় আগ্নেয় সম্ভাষ—মন তত
দৃঢ়তর, অচঞ্চল—দেখে রং, বিচিত্র-জীবন-চিত্র, ছায়াছবি—
সোনারং গোধূলির, ধূলিকীর্ণ নগরের ধূসর প্রসার
সব ভাল লাগে তবু, দেখি আর দেখি যত হৃদয়েতে সবই মরকত !

সব মন ছড়িয়েছে দ্রুপদকন্যার প্রেম জীবনের ঘাটে ঘাটে,
দিকে দিকে দ্বীপপুঞ্জে ; রঙিন-রাঙানো পথে ছড়িয়েছি প্রাণ,
অলিগলি রাজপথ সব পথে জীবনের সাগরের স্বাদ
খুঁজে পাই ; যত খুঁজি তত রং, যত শুনি সব কিছু গান ॥

শঙ্খ ঘোষ

(১৯৩২)

অন্তিম

আমায় বেছে বেছে বরণ করেছিল
বিশ্ববিধাতার একটি দুরাশা—
এখন দেখছি তা কিছুই পূর্ণ না,
বয়স যদ্যপি মাত্র বিরাশি।

সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায়
বসতি-নির্মাণ, বংশরক্ষা!
তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে
সিঁদুর-চিহ্নের মতন সখ্য।

কিন্তু সখাদের অস্থি ডাক দেয়
মস্ত সময়ের দাঁতের কৌটোয়,
প্রবল বহমান দুধারে গর্জিত—
অন্ধ শয়তান, টান দে বৈঠা!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

(১৯৩৩)

একজন মৌলভী আমাকে

এ যেন গুল্মের ডাল, আর আমি একটি বউল,
তার বেশি নই,
আমাকে বোলো না তুমি বোলো না রসুল,
আমি ফুটে উঠি আমি পথের ধুলোয় প'ড়ে রই

আল্লা বুড়ো আল্লা এই গুল্মোরের গাছ,
তাঁর খুব উঁচু ডাল মহম্মদ পয়গম্বর,
তুজনে দাঁড়িয়ে, দেখি চাঁদ আর সূর্য তুই আজ
তাদের মাথায়, কিন্তু আমাকেই নিয়ে যায় ঝড়।

খোদার ইমান আমি কখনো রাখিনি,
হিসাব দিতে যে হবে, আমায় অথর্ব
ক'রে দেবে ব'লে যেন একজোট পাপের ভাইনি
এক এক দিনে আমি তিনবার নমাজ পড়বো।

দিনে তিনবার, আমি একবার তুই হাত তুলে
তাঁকে বুকে নেবো, আমি তারপর হয়ে যাবো শিশু,
তাঁর বুকে যাবো ব'লে একেবারে হয়ে যাবো নিচু,
আমি যাঁর একটি বউল, সেই একটি বউলে

তাঁর বুক ভ'রে দেবো, আমায় কী ভাবো,
আল্লা, আমি হাসিমুখে হঠাৎ কবরে চলে যাবো॥

আনন্দ বাগচী

(১৯৩৩)

সহজিয়া

সমস্তটাই আমার শরীর এই যে কাঁপে থিরথিরিয়ে জল,
এই যে কাঁপে চোখের পাতা, লুব্ধ ঠোঁটে ছায়া,
বুকের কাছে টাল-খাওয়া রোদ্দুরে
        শঙ্খিনী মন ফনার নিচে ঘুমোয়,
সমস্তটাই আমার শরীর, আমার।

কাঁচের মধ্যে কতক্ষণ বা বাঁচে আমার শরীর
এ যে প্রথম কদমফুলের মত
আয়না ভরে ফুটে উঠলো, অস্ফুট আঘ্রানে।
অগ্নিপাটের শাড়ি রইল পড়ে আমার
হল না সেই
নিজের চোখে চোখ রেখে চুল বাঁধা।
বেলা গেল এমনি করে বেয়ে
ঝাপসা শব্দে জল পড়ে কলঘরে।

আমার বুকে কখন দিল ঢেউ জানি না, চোখ পড়েছে আজ
থমকে গেছে সমস্ত যৌবন
নগ্নবাহু বাউল জঙ্ঘায়
নানা রেখায় পড়েছে আজ বেলা শেষের রোদ,
কাঁচের মধ্যে কতক্ষণ বা বাঁচে আমার শরীর
আমি এখন ইস্কাপনের বিবি ॥

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

(১৯৩৩)

শতবর্ষ পরে

তুমি আজ নাম মাত্র, পটে লিখা ছবি, সত্য নও
সত্য নও আমাদের চেতনায়, সত্তায়, রক্তের
প্রদেশে বিদেশী তুমি আজো, ধ্রুবজ্যোতি নক্ষত্রের
ধ্রুপদী আলোয় যেন অনাত্মীয় গূঢ় কথা কও,
সেই কথা শোনে পোড়ো জমি, তার মৌরুসীভোগীরা!
তোমাকে নির্লজ্জ পড়ে—ক্রান্তপ্রজ্ঞ রবীন্দ্র-সংহিতা,

হিমাদ্রিকে মাপে তারা নিয়ে যেন মূঢ় গজ ফিতা,
কিংবা হিমাদ্রিকে পার হবে ভাবে পঙ্গু ভারতীরা।

নাম তুমি ছবি তুমি স্মৃতি তুমি হুজুগী সভায়
গন্ধে ধূপে মাল্যে আর সর্বজ্ঞের বিবর্ণ ভাষণে,
সত্য, সবই সত্য ;
তবু আসবে তুমি ভাবি অন্য মনে
এই পোড়ো জমি ভেঙে অন্যতর সকালবেলায়
ঘরভরা শূন্যতা সরিয়ে, দীপ্ত পূর্ণ ;
কিন্তু কবে ?

দ্বিতীয় ভারতবর্ষে দ্বিশতবার্ষিক উৎসবে ॥

হাইকু

এক

অস্ত-গোধূলিতে ও কার চিতা জ্বলে !
গৌরী মেঘ এক চলেছে পশ্চিমে
সতীর মতো সহমরণে চিতানলে !

দুই

নম্র মায়াবিনী হাওয়ার কন্যারা
দীঘির কালো জলে শীতলপাটি বোনে,
দিও না জলে ঢেউ, জলের বুকে সাড়া !

তিন

রাত্রি যেন অতলান্ত ঢেউ, আর
শুক্তি-মেঘে হাসে চাঁদিনী মুক্তার !

চার

নিরালা জানালায় এসেছে চাঁদ ফের,
স্মৃতির নহবতে হাজার বিবাহের
সাহানা বাজে বিসমিল্লা সাহেবের !

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৩)

জরাসন্ধ

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হল পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, কৃপণ জলে তেচোকো মাছের আঁশ গন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি? আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে গাহনে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।

তবে হয়ত মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার হয়ে আছি, অন্ধকার থাকবো এবং অন্ধকার হব।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯৩৩)

সহজ

কেমন সহজে আমি ফোটালাম এক লক্ষ ফুল
হঠাৎ দিলাম জেলে কয়েকটা সূর্য চাঁদ তারা
আবার খেয়াল হলে এক ফুঁয়ে নেভালাম সেই জ্যোৎস্না
(মনে পড়ে কোন জ্যোৎস্না ?) নেভালাম সেই রোদ (তাও মনে পড়ে ?)

নিন্দুকে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস করো না ।
হয়ত বলবে শিশু কিংবা নির্বোধ
অথবা ম্যাজিকওয়ালা ছেঁড়া তাঁবু, কাটা বাজনা, নানান সেলাই-
করা কালো কোর্তা গায়ে লোকটা কি মারণ-খেলা
খেলাচ্ছে আহারে ঐ মেয়েটার চোখে,
দর্শক ভুলছে না হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা
মায়ার ওষুধে ভুলছে ; বিশ্বাস কোরো না ।

দেখ্‌রে নিন্দুক দেখ্‌, বাম হাতে কনিষ্ঠ আঙুলে
ত্রিজগৎ ধরে আছি কেমন সহজে,
আমাকে অবাক চোখে দেখছে চেয়ে অন্ধকার, সমুদ্র, পাহাড়
শুধু কি তোরাই ভুললি বিস্ময়ের ভাষা !
আমার বাড়িতে আসবি, দেখবি সে কি আজব বাড়ি ?
মাথার উপরে ছাদ—চেয়ে দেখ, চারিদিকে দেয়াল রাখিনি,
(তোরাই দেয়াল-ঘেরা, বুকে স্বপ্ন, শ্লেষ্মা নিয়ে চিরকাল থাকবি সাবধানে
আঙুলে বয়েস গুনে—সখ করে সে দেয়ালে নানা ছবি এঁকে !)

বিষ্ণু দে

(১৯০৯)

জল দাও

ফাল্গুন আরম্ভে তার—
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই
কিংবা তারও আগে
ও-বছরে—বা আর বছরে
বছরে-বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো ঘেরা মাটির সংযমে
হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরস সজীব সংকল্পে গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে-পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে!
ও-বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিংবা তারও আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে
গোল্‌মোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐক্যতান থেমে যায় জামরুল-বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল!

তার পরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ে

কিংবা কি খবর শুনি কোথাও দাঙ্গার ক্লান্ত
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।

* *

গরমে বিবর্ণ হ'লো গোল্‌মোরের সাবেক জৌলুস—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জলে ঝরা মরা পোড়ো লেবার্নমে
এখানে-ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারের শানে পথে-পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ-বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে-খুঁজে যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে-ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় না কি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে-ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি-চুপি আমাদের পালা
কিংবা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে-থেকে হয়তো-বা আমাদের কেউ-কেউ মরীয়া হাঁপায়

জীবনে মৃত্যুতে কিংবা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে কোন দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় ছুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দক্ষমেরু কিংবা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের খেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কত চেলিউস্‌কিন ! হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়

*   *

হয়তো-বা নিরুপায়
হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি-রাশি বেলমল্লিকায়
বাগান বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতা-ঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার মরার মরীয়া যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি-বা হতুম ফুল বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
এ-কূলে ও-কূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে

কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা—না হ'লে বলবো তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্ত-সেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি
আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুকৃতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে-নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে-নিজে কিংবা সকলেই বেশি কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কেউ বেশি

আমাদেরই ইতিহাস মুহূর্তে-মুহূর্তে গোনে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে
আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহ-মনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়— কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
একপাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়

* *

এবারে উঠেছে হাওয়া ধোঁয়া নেই দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায়-হাওয়ায়
না কি কোনো দোলাই দেয় না সে ?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায়
হাসবে কি একাই নিষাদ ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণ চাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?

তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাদে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসংবাদ

উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক হিংস্র কণ্ঠ
হয়তো-বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা! তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুনেছি দেশে-দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
গ্রামে-গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
দুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে, নদী কিংবা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।

* *

হয়তো-বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে লিখে-লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে-নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিংবা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায়-শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে

অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান
কিংবা বুঝি মোহানার গান
হুগলীর নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহু স্রোত
রূপনারানের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের
অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ, সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিংবা যেন বল্লা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিংবা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে-সমুদ্রে ওঠে তালে-তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
ঊর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান

প্রাত্যহিকে-প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে-দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

* *

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার-ভাঁটায়
এ দেশে ও-দেশে নিত্য ঊর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
মরীয়া বন্যার যুদ্ধে কখনও-বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

আমি দূরে কখনও-বা কাছে পালে-পালে কখনও-বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি, ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জিয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে॥

চণ্ডীদাস বা দান্তে

উদাসীন চোখে দীর্ঘপক্ষ্ম ভিড়ে
কার যাতায়াত? চিরকাল উদ্‌ভ্রান্তি!
চেনা-অচেনায় চেতনার কোথা ক্ষান্তি?

উভবলী ঐ হৃদয়ে উষ্ণ নীড়ে
সে কোন্ আকাশ বাসা বেঁধে পায় শান্তি ?

ওগো মনসিজা, তুমি যে চাইলে ভিক্ষা
অতনুর আয়ু ত্রিকালের পদপ্রান্তে
সে কি শুধু মনুপরাশর-দের শিক্ষা ?
সে কি নিতান্ত প্রথামতো ? তুমি জানতে
প্রেমের তৃপ্তি-অতৃপ্তি-একই দীক্ষা,

চির-অস্থির উদাত্ত এক শান্তি
যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে ?

প্রাকৃত কবিতা

মাসী, তোর কথা বেঁধে রাখ্ তোর খোঁপায়,
আমার ও কালো কম্বলই ভালো,
যতবার ধোবে রংছুট নয়, পাকা।

মাসী তুই বৃথা বকিস্, আমের ঝাঁকা
মাথায় তুলে নে ঘরে জামবাটী ভ'রে
আমচুর খাস, থাকুক আমার কালো।

কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি প্রেম,
আমার রাতের কারার আকাশে জ্বেলেছে একটি তারা,
আমাকেই বলে তার দুচোখের একটি সন্ধ্যাতারা।

নির্ভয় বীর, বিরাট আঁধারে সে আমার অমাবস্যা,
ছদ্মবেশের চাঁদ,
আমাকে কি তুই করবি কথার বিজলিতে দিশাহারা ?

কোনো আশা নেই, মাসী তুই ঘরে গিয়ে
হাটের লোককে শোনাস্ জ্ঞানের কথা,
সে কানে মানাবে এসব কথার ছাঁদ।

ছড়াস্ নে তোর মুক্তার মালা, হবে না রে অন্যথা,
সে যবে আসবে শহরের কাজ সেরে
তাকেই করব বিয়ে।

আসবে অনেকদিনের হারের মধ্যে লড়াই জিতে
অনেক মিছিলে সঞ্চিত সংগীতে,
আসবে আমার সহিষ্ণু সংবিতে।

উঠানের গাছ কেটে কচি কলাপাতে
ক্ষেতের ধানের ভাতে
ঘরে সরতোলা ঘি দেব একছটাক,

দীঘির পাড়ের নালিচা শাকের ব্যঞ্জন,
খাসের বাঁধের মৌরলা মাছ, পাটলীর দুধে ক্ষীর
ওরে মাসী আমি দেব সুখে নিজহাতে,

দেখব অবাক চোখে,
খাবেন পুণ্যজন।···
আমার কথায় এখন যে দেখি মাসী তুই অস্থির॥

ভাষা

ভয় নেই, মনে রেখো আশা,
মমতায় ব্যাপ্ত করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে তনু শালবন,
তিতিরের ডাক শোনো ঘুঘুর কূজন

হাঁসের ঝাপট আর ময়ূরের নাচ,
এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা।

এখনই কি ভয়? রেখো আশা,
প্রাত্যহিকে মগ্ন করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে চলেছে বুনন,
খামারে খামারে ধান, বাগানে গুঞ্জন,
পরবের দিনে রাতে মাঠে ঘরে নাচ,
এখানেই ভিৎ গড়ে ভাষা।

ভয় কেন কবি? আছে আশা,
সততায় স্থির করো মন,
স্থির লক্ষ্য চলেছে পিস্টন্,
লেথের আবর্তে গড়ো নানা আয়োজন,
ক্রেণের বাহুতে দেখ বিশ্বব্যাপী নাচ,
সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালী ধনুকের টানে টানে ঝনন্-রণন
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র-স্বনন,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা॥

চিরঋণী

পৌঁছলুম ভোরের আকাশে,
তখনও জড়ানো রাত্রি গাছে ঘাসে মাটিতে পাথরে।

নিস্তব্ধ বাতাসে বাজে মুড়ির স্বরদ আর জলের সেতার
নানান্ কলিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোমলে কড়িতে পাশ কেটে
আশাবরী যোগিয়া তোড়ীতে।

ডাইনে ঝোপের ডাকে ঢুকে দেখি একটি ঝলক
শুধু দুটি চোখ জ্বলে আসন্ন সন্ত্রাসে স্থির
ঘৃণায় ও ভয়ে নিষ্পলক সম্বৃত চিতার দুটি চোখ।

সারাদিন জরিপের অরণ্যরোদন।
বাংলোয় ঘনায় রাত্রি,
তামা দিয়ে লোহা দিয়ে গড়া অন্ধকার
অথচ ভিতরে ছোটে শত সরীসৃপের সংশয়।

চলে গেছে খিদ্‌মদগার তার দূর গ্রাম্য ঘরে।
আমি একা বসে আছি পরিশ্রান্ত
ঘুমের আশার যাত্রী কণ্টকিত অরণ্যের নানা নৈশস্বরে।

আর থেকে থেকে মুহূর্তের অবশ অসাড়
স্তব্ধতার অতল সাগরে
ডুবে যাই আর ভেসে উঠি, তাকাই দুয়ারে খিল কিনা।

যখন ঝিঁঝির বাণী মাঝরাতের মৈহারী রাগিণী
ধরে ধরে প্রায়,
আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দেখি
কাচের ওপারে একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্তু নির্ভরে উপহারে।

জীবজগতের কাছে সেই থেকে আমি চিরঋণী॥